আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সংসার ত্যাগ আল্লাহ্‌র সীমার ভিতরে হলে বৈধ, নতুবা হারাম ঃ উল্লিখিত আয়াত-সমূহে বলা হয়েছে যে, সংসার বিরাগ ও ভোগ-বিলাস ত্যাগ করা যদিও এক পর্যায়ে প্রশংসনীয়, কিন্তু এতেও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা নিন্দনীয় ও হারাম। এর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার তিনটি স্তর ঃ কোন হালাল বস্তুকে হারাম করে নেওয়ার তিনটি স্তর রয়েছে। এক, বিশ্বাসগতভাবে হারাম মনে করে নেওয়া। দুই, উক্তির মাধ্যমে কোন বস্তুকে নিজের জন্য হারাম করে নেওয়া। উদাহরণত এরূপ প্রতিজ্ঞা করা যে, ঠাণ্ডা পানি পান করবে না, কিংবা অমুক হালাল খাদ্য খাবে না অথবা অমুক জায়েয কাজ করবে না। তিন, বিশ্বাস ও উক্তি কিছুই নয় কিন্তু কার্যত কোন হালাল বস্তুকে চিরতরে বর্জন করার সংকল্প করে নেওয়া।

প্রথমাবস্থায় যদি ঐ বস্তু অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে হালাল হয়ে থাকে, তবে তাকে হারাম বলে যে লোক বিশ্বাস করবে সে আল্লাহ্‌র আইনের প্রকাশ্য বিরুদ্ধাচরণের কারণে কাফির হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়াবস্থায় যদি কসমের শব্দ যোগে হালাল বস্তুটিকে নিজের উপর হারাম করে থাকে তবে কসম শুদ্ধ হবে। কসমের শব্দ অনেক, যা ফিক্‌হ্ গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লিখিত রয়েছে। উদাহরণত কেউ এরূপ বলে যে, আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, অমুক বস্তু খাব না কিংবা অমুক কাজ করব না। অথবা এরূপ বলে যে, আমি অমুক বস্তু কিংবা অমুক কাজকে নিজের উপর হারাম করছি। বিনা প্রয়োজনে এরূপ কসম খাওয়া গোনাহ্। কিন্তু এরূপ কসম ভঙ্গ করলে তার কাফ্‌ফারা দেওয়া জরুরী। কাফ্‌ফারার বিবরণ পরে বর্ণিত হবে।

তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বিশ্বাস ও উক্তি দ্বারা কোন হালালকে হারাম না করে কার্যত হারামের মত ব্যবহার করলে যদি এরূপ বর্জনকে সওয়াবের কাজ মনে করে, তবে তা বিদ-'আত এবং বৈরাগ্য বা সংসার ত্যাগ বলে গণ্য হবে। এরূপ বৈরাগ্য যে মহাপাপ তা কোরআনের স্পষ্ট আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। এর বিরুদ্ধাচরণ করা ওয়াজিব এবং এরূপ বিধি-নিষেধে অটল থাকা গোনাহ্। তবে এরূপ বিধি-নিষেধ সওয়াবের নিয়তে না হয়ে অন্য কোন কারণে যথা, কোন দৈহিক কিংবা আত্মিক অসুস্থতার কারণে কোন বিশেষ বস্তুকে স্থায়ীভাবে বর্জন করলে তাতে কোন গোনাহ্ নেই। কোন কোন সূফী বুযুর্গ হালাল বস্তু বর্জন করেছেন বলে যেসব ঘটনা বর্ণিত আছে, তা এমনি ধরনের বর্জনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা এসব বস্তুকে স্বীয় নফসের জন্য ক্ষতিকর মনে করেছেন কিংবা কোন বুযুর্গ ক্ষতিকর বলেছেন। তাই প্রতিকারার্থ তা বর্জন করেছেন। এতে কোন দোষ নেই।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করো না। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা সীমাতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না।

সীমা অতিক্রম করার অর্থ এই যে, কোন হালাল বস্তুকে বিনা ওযরে সওয়াব মনে করে বর্জন করা। অজ্ঞ ব্যক্তি একে তাক্ওয়া তথা আল্লাহ্ভীরুতা মনে করে। অথচ আল্লাহ্র কাছে এটা সীমাতিক্রম ও অবৈধ। তাই দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে পবিত্র ও হালাল বস্তু তোমাদের দিয়েছেন, তা খাও এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, যার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, হালাল ও পবিত্র বস্তুকে সওয়াব মনে করে বর্জন করা তাক্ওয়া নয়, বরং আল্লাহ্র নিয়ামত মনে করে ব্যবহার করা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার মধ্যে তাক্ওয়া নিহিত। হ্যাঁ, কোন দৈহিক ও আত্মিক রোগের প্রতিকারার্থ কোন বস্তু বর্জন করলে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(৮৯) আল্লাহ্ তোমাদের পাকড়াও করেন না তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য; কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য, যা তোমরা মজবুত করে বাঁধ। অতএব, এর কাফ্ফারা এই যে, দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোযা রাখবে। এটা কাফ্ফারা তোমাদের শপথের, যখন শপথ করবে। তোমরা স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা করবে। এমনিভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বীয় নির্দেশ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে পাক-পবিত্র বস্তু হারাম করার কথা বর্ণিত হয়েছিল। এ হারাম-করণ মাঝে মাঝে কসম তথা শপথের মাধ্যমে হয়। তাই এখন শপথ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ বর্ণনা করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে (জাগতিকভাবে) পাকড়াও করেন না (অর্থাৎ কাফ্ফারা ওয়াজিব করেন না) তোমাদের অসত্য শপথের জন্য (অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার জন্য)। কিন্তু (এমন) পাকড়াও এজন্য করেন যখন তোমরা শপথসমূহকে (ভবিষ্যৎ বিষয়ের জন্য) মজবুত কর (অতঃপর তা ভঙ্গ কর)। অতএব, এর (অর্থাৎ এ রকম শপথ ভঙ্গের) কাফফারা (এই যে,) দশ জন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য,যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে (সাধারণভাবে) দিয়ে থাক অথবা (দশ জন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর) বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী মুক্ত করে দেবে। (অর্থাৎ উল্লিখিত তিনটির মধ্যে যে কোন একটি কাজ করবে)। আর যে ব্যক্তি (তিনটির মধ্য থেকে একটিরও) সামর্থ্য রাখে না, (সে কাফ্ফারা হিসাবে) তিনদিন (উপর্যুপরি) রোযা রাখবে। (যা বর্ণিত হল), এটা হচ্ছে কাফ্ফারা তোমাদের (এমন) শপথের যখন তোমরা শপথ কর (অতঃপর তা ভঙ্গ কর)। এবং (যেহেতু এ কাফ্ফারা ওয়াজিব, তাই) স্বীয় শপথসমূহ রক্ষা কর। (এমন যেন না হয় যে, শপথ ভঙ্গ কর এবং কাফ্ফারা আদায় না কর। আল্লাহ্ তা'আলা এ নির্দেশটি যেমন তোমাদের পার্থিব ও ধর্মীয় উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে বর্ণনা করেছেন), তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য স্বীয় (অন্যান্য) বিধান (ও) বর্ণনা করেন---যাতে তোমরা (এ নিয়ামতের অর্থাৎ সৃষ্ট জীবের উপকারের প্রতি লক্ষ্য রাখার) কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শপথের কয়েকটি প্রকার ও তার বিধান ঃ আলোচ্য আয়াতে শপথের কয়েকটি প্রকার বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি সূরা বাকারায়ও বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোর সারকথা এই যে, যদি অতীত ঘটনা সম্পর্কে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা শপথ করা হয়, তবে ফিকাহ্বিদদের পরিভাষায় এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। উদাহরণত কেউ একটি কাজ করে ফেলল এবং সে জানে যে, এ কাজটি সে করেছে। এরপর সে জেনেশুনে শপথ করে যে, সে কাজটি করেনি। এ মিথ্যা শপথ কবীরা গোনাহ্ এবং ইহকাল ও পরকালে শাস্তির কারণ। কিন্তু এর জন্য কোনরূপ কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না---তওবা ও ইস্তেগফার করা জরুরী। এ কারণেই একে ফিকহ্বিদদের পরিভাষায় 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। কেননা, গুমূসের অর্থ যে ডুবিয়ে দেয়। এ শপথ শপথকারীকে গোনাহ্ ও শাস্তিতে ডুবিয়ে দেয়।

দ্বিতীয় প্রকার এই যে, নিজ ধারণায় সত্য মনে করে কোন অতীত ঘটনা সম্পর্কে শপথ করা; কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হওয়া। উদাহরণত কোন সূত্রে জানা গেল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এর উপর নির্ভর করে কেউ শপথ করল যে, অমুক ব্যক্তি এসে গেছে। এরপর দেখা গেল যে, এটা বাস্তবের বিপরীত। রূপ শপথকে 'ইয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। এমনিভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে মুখে শপথবাক্য উচ্চারিত হলে একেও 'ইয়ামীনে লগ্ভ' বলা হয়। এরূপ শপথে গোনাহ্ নেই এবং কাফ্ফারাও দিতে হয় না।

তৃতীয় প্রকার এই যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করা বা না করার শপথ করা। এরূপ শপথকে 'ইয়ামীনে মুনআকিদা' বলা হয়। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়। তবে কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্ হয়, কিন্তু কোন কোন অবস্থায় গোনাহ্ হয় না।

এস্থলে কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াতে লগ্‌ভ বলে বাহ্যত এমন শপথকেই বোঝানো হয়েছে, যাতে কাফ্‌ফারা নেই ; গোনাহ্ হোক বা না হোক। কেননা, এর বিপরীতে عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ উল্লিখিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, এখানে পাকড়াও করার অর্থ জাগতিক-ভাবে পাকড়াও, যা কাফ্‌ফারার আকারে হয়।

সূরা বাকারার আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ -

এখানে لغو বলে ঐ শপথকে বোঝানো হয়েছে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে, কিংবা কেউ নিজ ধারণায় সত্য মনে করে, শপথ করে কিন্তু বাস্তবে তা অসত্য হয়। এর বিপরীতে ঐ শপথ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা হয়। একে 'ইয়ামীনে গুমূস' বলা হয়। অতএব, এ আয়াতের সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভে গোনাহ্ নেই—ইয়ামীনে গুমূসে গোনাহ্ আছে, যাতে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলা হয়। সূরা বাকারায় পার-লৌকিক গোনাহ্ বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা মায়েদার আলোচ্য আয়াতে জাগতিক নির্দেশ অর্থাৎ কাফ্‌ফারা বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, ইয়ামীনে লগভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে পাকড়াও করেন না, অর্থাৎ—কাফ্‌ফারা ওয়াজিব করেন না, বরং কাফ্‌ফারা শুধু ঐ শপথের জন্যই ওয়াজিব করেন যা ভবিষ্যতে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে করা হয় এবং অতঃপর তা ভঙ্গ করা হয়। এরপর কাফ্‌ফারার বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَكَفَّارَتُهٗ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ -

অর্থাৎ তিনটি কাজের মধ্য থেকে স্বেচ্ছায় যে কোন একটি কাজ করতে হবে ঃ এক. দশজন দরিদ্রকে মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য সকাল-বিকাল দু'বেলা খাওয়াতে হবে, কিংবা দুই. দশ জন দরিদ্রকে 'সতর ঢাকা' পরিমাণ পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। উদাহরণত একটি পায়জামা অথবা একটি লুঙ্গি অথবা একটি লম্বা কোর্তা, কিংবা তিন. কোন গোলাম মুক্ত করতে হবে।

এরপর বলা হয়েছে فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ অর্থাৎ কোন শপথ ভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি এ আর্থিক কাফ্ফারা দিতে সমর্থ না হয়, তবে তার জন্য কাফ্ফারা এই যে, সে তিন দিন রোযা রাখবে। কোন কোন রেওয়ায়েতে এখানে উপর্যুপরি তিন রোযা রাখার নির্দেশ রয়েছে। তাই ইমাম আবূ হানীফা (র) ও অন্য কয়েকজন ইমামের মতে শপথের কাফ্ফারা হিসাবে যে রোযা রাখা হবে তা উপর্যুপরি হওয়া জরুরী।

আলোচ্য আয়াতে শপথের কাফ্ফারা প্রসঙ্গে প্রথমে اَطْعَامُ শব্দ বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় এর অর্থ খাদ্য খাওয়ানো হয়, তেমনি কাউকে খাদ্য দান করাও হয়। তাই ফিকহবিদরা আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এরূপ সাব্যস্ত করেছেন যে দাতা ইচ্ছা করলে দশ জন দরিদ্রকে আহারও করিয়ে দিতে পারে এবং ইচ্ছা করলে খাদ্য তার মালিকানায় দিয়ে দিতে পারে। কিন্তু আহার করালে তা মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য হতে হবে, যা সে নিজ গৃহে খেতে অভ্যস্ত। দশজন দরিদ্রকে দু'বেলা পেট ভরে খাওয়াতে হবে। পক্ষান্তরে খাদ্য দান করলে প্রত্যেক দরিদ্রকে একজনের ফিতরা পরিমাণ দিতে হবে। অর্থাৎ পৌনে দু'সের গম অথবা তার মূল্য। মোট কথা উপরোক্ত তিনটি কাজের মধ্যে যে কোন একটি করতে হবে। কিন্তু রোযা রাখা তখনই যথেষ্ট হতে পারে, যখন তিনটির মধ্যে যে কোন একটিরও সামর্থ্য না থাকবে।

শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে তা ধর্তব্য নয়ঃ আয়াতের শেষভাগে হুঁশিয়ার করার জন্য দু'টি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ অর্থাৎ এ হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ কর। ইমাম আজম আবূ হানীফা (র) ও অন্যান্য অধিকাংশ ইমামের মতে এর উদ্দেশ্য এই যে, যখন তোমরা কোন ভবিষ্যৎ কাজ করা না করার ব্যাপারে শপথ কর, এরপর যদি এর বিপরীত হয়ে যায়, তবে সেজন্য যে কাফ্ফারা দিতে হবে তা উপরে বর্ণিত হল। এর সারমর্ম এই যে, শপথ ভঙ্গ হওয়ার পরই কাফ্ফারা দেওয়া দরকার। শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিলে তা ধর্তব্য হবে না। এর কারণ এই যে, যে বিষয় কাফ্ফারাকে জরুরী করে, তা হল শপথ ভঙ্গ করা। অতএব শপথ ভঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত কোন কাফ্ফারা ওয়াজিব নয়। সুতরাং সময় হওয়ার পূর্বে যেমন নামায হয় না, রমযান মাস আগমনের পূর্বে যেমন রমযানের রোযা হয় না, তেমনি শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে শপথের কাফ্ফারাও আদায় হবে না।

এরপর বলেছেন ঃ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ অর্থাৎ স্বীয় শপথ রক্ষা কর। উদ্দেশ্য এই যে, কোন বিষয়ে শপথ করে ফেললে শরীয়তসম্মত কিংবা প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া

শপথ ভঙ্গ করে না। কেউ কেউ বলেন ঃ এর উদ্দেশ্য এই যে, শপথ করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না ---শপথকে রক্ষা কর। একান্ত অপারক না হলে শপথ করো না।---(মাযহারী)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾

(৯০) হে মু'মিনগণ, এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ—এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক—যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও। (৯১) শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না? (৯২) তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত হও, রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার বৈ নয়।

যোগসূত্র ঃ উপরে হালাল বস্তু বিশেষ পদ্ধতিতে বর্জন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এখন কতিপয় হারাম বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ইত্যাদি এবং ভাগ্যনির্ধারক শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থাক---যাতে তোমরা (এগুলোর ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষার কারণে---যা পরে বর্ণিত হবে) সুফলপ্রাপ্ত হও। (দীন-দুনিয়া উভয়ের জন্যই এগুলো ক্ষতিকর। আর ক্ষতিগুলো এই ঃ) শয়তান তো চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পর (ব্যবহারে) শত্রুতা এবং (অন্তরে) বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দেয় (সেমতে একথা স্পষ্ট যে, মদ্যপানে বুদ্ধি-বিবেক লোপ পায়। ফলে গালিগালাজ ও দাঙ্গা-ফাসাদ হয়ে যায়, এতে পরবর্তীকালেও স্বভাবত মনোমালিন্য বাকী থাকে। জুয়ায় যে ব্যক্তি হেরে যায়, সে বিজয়ীর প্রতি ক্রোধান্বিত হয়। সে যখন দুঃখিত হবে, অন্যের উপরও এর প্রভাব পড়বে। এ হচ্ছে জাগতিক ক্ষতি) এবং (শয়তান চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে)

আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র ও নামায থেকে (যা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার একটি উত্তম পন্থা) তোমাদের বিরত রাখে (সেমতে এ বিষয়টিও স্পষ্ট, কেননা মদ্যপায়ীর তো সংজ্ঞাই ঠিক থাকে না এবং জুয়ার বিজয়ী পক্ষ আনন্দ-উল্লাসে ডুবে থাকে, আর পরাজিত ব্যক্তি পরাজয়ের দুঃখ ও গ্লানিতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। এরপর সে বিজয় লাভের চেষ্টায় এমন ব্যাপৃত হয়ে পড়ে যে, অন্য কোন কিছুর খেয়ালই থাকে না। এ হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষতি। এগুলো যখন এমন মন্দ বস্তু) অতএব (বল) তোমরা এখনও কি নিবৃত্ত হবে না ? এবং আল্লাহ্‌র অনুগত হও ও রসূলের অনুগত হও এবং আত্মরক্ষা কর। কিন্তু যদি তোমরা বিমুখ হও, তবে জেনে রাখ, আমার রসূলের দায়িত্ব প্রকাশ্য প্রচার ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মানুষের কল্যাণের জন্যই বস্তুজগতের সৃষ্টি ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে একথা বলাই উদ্দেশ্য যে, রাব্বুল আলামীন সমগ্র বিশ্বকে মানুষের উপকারার্থই সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রত্যেক বস্তুকে মানুষের বিশেষ বিশেষ কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং মানুষকে সমগ্র বিশ্বের সেবার যোগ্য করেছেন। তবে তিনি মানুষের প্রতি শুধু একটি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তা এই যে, আমার সৃষ্ট বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার যে সীমা আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি, তা লংঘন করবে না। যেসব বস্তু তোমাদের জন্য হালাল ও পবিত্র করেছি, সেগুলো থেকে বিরত থাকা ধৃষ্টতা ও অকৃতজ্ঞতা এবং যেসব বস্তুর বিশেষ ব্যবহারকে হারাম করেছি, তার বিরুদ্ধাচরণ করা অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ। দাসের কর্তব্য প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী তার সৃষ্ট বস্তুকে ব্যবহার করা, এরই নাম দাসত্ব।

প্রথম আয়াতে মদ, জুয়া, মূর্তি এবং ভাগ্য পরীক্ষার শর—এই চারটি বস্তুকে হারাম বলা হয়েছে। এ বিষয়বস্তুরই একটি আয়াত প্রায় একই ধরনের শব্দ সহযোগে সূরা বাকারায়ও উল্লিখিত হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ -

এতে উপরোক্ত চার বস্তুকে رجس বলা হয়েছে। আরবী ভাষায় رجس এমন নোংরা বস্তুকে বলা হয়, যার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণা জন্মে। এ চারটি বস্তুও এমন যে, সামান্য সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মনেই এগুলোর প্রতি আপনা আপনিই ঘৃণা জন্মে।

'আযলাম'-এর ব্যাখ্যা ঃ এ চার বস্তুর মধ্যে ازلام অন্যতম। এটি زلم -এর বহুবচন। যলাম এমন শরকে বলা হয়, যদ্দ্বারা আরবে ভাগ্য নির্ধারণী জুয়া খেলার প্রথা প্রচলিত ছিল। দশ ব্যক্তি শরীক হয়ে একটি উট যবাই করত। অতঃপর এর গোশত সমান দশ ভাগে ভাগ করার পরিবর্তে তা দ্বারা জুয়া খেলা হত। দশটি শরের সাতটিতে বিভিন্ন

অংশের চিহ্ন অঙ্কিত থাকত। কোনটিতে এক এবং কোনটিতে দুই বা তিন অংশ অঙ্কিত থাকত। অবশিষ্ট তিনটি শর অংশবিহীন সাদা থাকত। এ শরগুলোকে তূনের মধ্যে রেখে খুব নাড়াচাড়া করে নিয়ে একেক অংশীদারের জন্য একটি শর বের করা হত। যত অংশ-বিশিষ্ট শর যার নামে বের হত, সে তত অংশের অধিকারী হত এবং যার নামে অংশবিহীন শর বের হত, সে বঞ্চিত হতো। আজকাল এ ধরনের অনেক লটারি বাজারে প্রচলিত আছে। এগুলোও জুয়া এবং হারাম।

লটারির জায়েয প্রকার ঃ এক প্রকার লটারি জায়েয এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে প্রমাণিত আছে। তা এই যে, সবার অধিকার সমান এবং অংশও সমান বন্টন করা হয়েছে। এখন কার অংশ কোন্টি, তা লটারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়। উদাহরণত একটি গৃহ চারজন অংশীদারের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এখন মূল্যের দিক দিয়ে গৃহটিকে সমান চার ভাগে ভাগ করতে হবে। অতঃপর কে কোন্ ভাগ নেবে, তা যদি পারস্পরিক সম্মতি-ক্রমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না হয়, তবে লটারির মাধ্যমে যার নামে যে অংশ আসে, তা তাকে দেওয়া জায়েয। অথবা মনে করুন, কোন একটি বস্তুর প্রার্থী এক হাজার জন এবং সবার অধিকারই সমান। কিন্তু যে বস্তুটি ভাগ করতে হবে, তা সর্বমোট একশটি। এক্ষেত্রে লটারিযোগে মীমাংসা করা যায়।

জুয়ার শর দ্বারা গোশত বন্টনের মূর্খজনোচিত প্রথা যে হারাম তা সূরা মায়েদার এক আয়াতে পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে ঃ —وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْاَزْلَامِ

মোট কথা, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত চারটি হারাম বস্তুর মধ্যে দু'টি অর্থাৎ জুয়া ও ভাগ্য নির্ধারক শর ফলাফলের দিকে দিয়ে একই বস্তু। অবশিষ্ট দু'টির মধ্যে একটি হচ্ছে انصاب যা نصب-এর বহুবচন ঃ نصب এমন বস্তুকে বলে, যাকে ইবাদত করার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয়---তা মূর্তি অথবা বৃক্ষ, প্রস্তর ইত্যাদি যাই হোক।

মদ ও জুয়ার দৈহিক ও আত্মিক ক্ষতি ঃ এ আয়াত অবতরণের হেতু ও পরবর্তী আয়াতদৃষ্টে বোঝা যায় যে, আলোচ্য আয়াতে দু'টি বস্তুর নিষেধাজ্ঞা ও ক্ষতি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ মদ ও জুয়া---انصاب তথা মূর্তির প্রসঙ্গ এর সাথে জুড়ে দেওয়ার কারণ---যাতে শ্রোতা বুঝে নেয় যে, মদ ও জুয়ার ব্যাপারটিও মূর্তিপূজার মতই জঘন্য অপরাধ।

ইবনে মাজার এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ شارب الخمر كعابد الوثن অর্থাৎ মদ্যপায়ী মূর্তিপূজারীর সমতুল্য অপরাধী। কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ شارب الخمر كعابد اللات والعزى—অর্থাৎ মদ্যপায়ী লাত ও ওয্যার উপাসকেরই মত।

মোট কথা, এখানে মদ ও জুয়ার কঠোর অবৈধতা এবং এগুলোর আত্মিক ও দৈহিক

ক্ষতি বর্ণিত হয়েছে। প্রথমে আত্মিক ক্ষতি رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ বাক্যে বিবৃত হয়েছে। এর অর্থ এই যে, এগুলো সুস্থ বিবেকের কাছে নোংরা ও ঘৃণার্হ এবং শয়তানের চক্রান্ত জাল। এতে একবার আবদ্ধ হয়ে গেলে মানুষ অসংখ্য ক্ষতি ও মারাত্মক অনিষ্টের গর্তে নিপতিত হয়। এসব আত্মিক ক্ষতি বর্ণনা করার পর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ فَاجْتَنِبُوهُ অর্থাৎ এগুলো যখন এমন ক্ষতিকর, তখন এগুলো থেকে বিরত ও বেঁচে থাক।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে ঃ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ—এতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল এগুলো থেকে বেঁচে থাকার উপরই নির্ভরশীল।

এরপর দ্বিতীয় আয়াতে মদ ও জুয়ার জাগতিক ও বাহ্যিক ক্ষতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ-

অর্থাৎ শয়তান তোমাদেরকে মদ ও জুয়ায় লিপ্ত করে তোমাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করতে চায়।

আলোচ্য আয়াতগুলো যেসব ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয় তা এই যে, মদের নেশায় বিভোর হয়ে এমন সব কাণ্ডকীর্তি সংঘটিত হয়েছিল, যা প্রথমে পারস্পরিক ক্রোধ ও প্রতিহিংসা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সত্য বলতে কি, এটা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না বরং মদের নেশায় মানুষ যখন জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে তখন এরূপ কাণ্ডকীর্তি অনিবার্যভাবেই সংঘটিত হয়ে পড়ে।

জুয়ার ব্যাপারটিও তদ্রূপ। পরাজিত ব্যক্তি যদিও তাৎক্ষণিকভাবে পরাজয় স্বীকার করে নিরস্ত হয়েও যায়, কিন্তু প্রতিপক্ষের প্রতি ক্রোধ, গোস্বা, শত্রুতা এর অন্যতম অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। হযরত কাতাদাহ্ (র) এ আয়াতের তফসীরে বলেন ঃ কোন কোন আরবের অভ্যাস ছিল যে, জুয়ায় পরিবার-পরিজন, অর্থ-কড়ি ও আসবাবপত্র সব খুইয়ে চরম দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করত।

আয়াতের শেষে এগুলোর আরও একটি অনিষ্ট বর্ণনা করে বলা হয়েছে ঃ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ অর্থাৎ এগুলো তোমাদেরকে আল্লাহ্র যিক্র ও নামায থেকে গাফিল করে দেয়।

এটি বাহ্যত আত্মিক ও পারলৌকিক অনিষ্ট, জাগতিক অনিষ্টের পর পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এতে এই ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, চিরস্থায়ী জীবনই প্রকৃত প্রণিধানযোগ্য জীবন। এ জীবনের সৌন্দর্যই জ্ঞানী ব্যক্তির কাম্য হওয়া উচিত এবং এর অনিষ্টকেই ভয় করা দরকার। ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য যেমন গর্বের বিষয় নয়, তেমনি এর অনিষ্টও অধিক দুঃখ ও কষ্টের কারণ নয়। কেননা, এ জীবনের সৌন্দর্য ও অনিষ্ট উভয়টিই কয়েক দিনের অতিথি।

دورانِ بقا چو بادِ صحرا بگذشت
تلخی و خوشی و زشت و زیبا بگذشت

এ কথাও বলা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায থেকে গাফিল হওয়া ইহকাল ও পরকাল এবং দেহ ও আত্মা উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। পরকাল ও আত্মার জন্য যে ক্ষতিকর সে কথা বলাই বাহুল্য। কেননা, আল্লাহ্ থেকে গাফিল বে-নামাযীর পরকাল বরবাদ এবং তার আত্মা মৃত। একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ থেকে গাফিল ব্যক্তির ইহকালও তার প্রাণের শত্রু হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ্ থেকে গাফেল হয়ে যখন তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য অর্থ-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম ও জাঁকজমক অর্জন হয়ে যায়, তখন এগুলোও একা আসে না, বরং সাথে করে অনেক জঞ্জালও নিয়ে আসে, যা চিন্তার বোঝা হয়ে অহোরাত্র তার মস্তিষ্কে সওয়ার হয়ে থাকে। এ চিন্তায় লিপ্ত হয়ে মানুষ জীবনের আসল উদ্দেশ্য সুখ, শান্তি ও বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে এবং আরামের কথাই ভুলে যায়। যদি কোন সময় এ অর্থ-সম্পদ, মান-সম্ভ্রম ও জাঁকজমক খোয়া যায় কিংবা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, তখন আর চিন্তার কোন সীমা—পরিসীমা থাকে না। মোট কথা, খাঁটি দুনিয়াদার মানুষ উভয় অবস্থাতেই দুঃখ, চিন্তা-ভাবনা ও ক্লেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

اگر دنیا نباشد درد مندیم
وگر باشد بمهرش پائے بندیم

যে ব্যক্তির অন্তর আল্লাহ্‌র যিক্‌রে উজ্জ্বল এবং নামাযের নূর দ্বারা আলোকিত তার অবস্থা এর বিপরীত। জগতের অর্থ-সম্পদ, জাঁকজমক ও উচ্চপদ তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে এবং তাকে প্রকৃত শান্তি ও আরাম দান করে। যদি এগুলো খোয়া যায়, তবে এতে তার অন্তরে বিন্দুমাত্রও প্রতিক্রিয়া হয় না। তার অবস্থা এরূপ ঃ

نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے
بہ پیش همّت ما هرچہ آمد بود مهمانے

মোট কথা এই যে, আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায থেকে গাফিল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এতে পারলৌকিক ও ইহলৌকিক উভয় প্রকার ক্ষতিই রয়েছে। এজন্য এটা সম্ভব যে, يُوقِعَ بَيْنَكُمُ বাক্যে খাঁটি আত্মিক ক্ষতি رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

يَصُدَّكُمْ عَنْ বাক্যে খাঁটি জাগতিক ও শারীরিক ক্ষতি এবং الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ

ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ বাক্যে ইহকাল ও পরকালের উভয়বিধ ক্ষতি বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, নামাযও আল্লাহ্‌র যিকরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার তাৎপর্য কি? কারণ এই যে, নামাযের গুরুত্ব এবং এটি যে আল্লাহ্‌র যিকরের উত্তম ও সেরা প্রকার, সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য নামাযকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যাবতীয় ধর্মীয়, জাগতিক, দৈহিক ও আত্মিক অনিষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা করার পর এসব বস্তু থেকে বিরত রাখার জন্য অভূতপূর্ব চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ঃ فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُونَ — অর্থাৎ এসব অনিষ্ট জেনে নেওয়ার পরেও কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?

উপরোক্ত দু'আয়াতে মদ, জুয়া ইত্যাদির অবৈধতা ও কঠোর নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র আইনের একটি বিশেষ ধারা। তৃতীয় আয়াতে এ নির্দেশের বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য কোরআন পাক বিশেষ বর্ণনাভঙ্গি অনুসরণ করে বলেছে ঃ

وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ -

এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও রসূলের আনুগত্যের নির্দেশ তোমাদেরই উপকারার্থ দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা অমান্য কর, তবে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই এবং তাঁর রসূলেরও কোন অনিষ্ট হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যে লাভ-ক্ষতির উর্ধ্বে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। রসূল সম্পর্কে এরূপ ধারণা হতে পারত যে, তাঁর আদেশ পালিত না হলে সম্ভবত তাঁর সওয়াব ও মর্তবা হ্রাস পাবে। এ ধারণা নিরসনের জন্য বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ—অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রসূলের আদেশ পালন না করে, তবে তাতে তাঁর মর্তবা হ্রাস পাবে না। কারণ তাঁকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল, তা তিনি সম্পন্ন করেছেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল খোলাখুলি-ভাবে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দেওয়া। এরপর কেউ না মানলে, সে তার নিজেরই ক্ষতি করে। আমার রসূলের এতে কিছুই যায় আসে না।

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا
مَا اتَّقَوْا وَّآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا
وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ
اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ
يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ
الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ
وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۗ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا
لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

(৯৩) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা পূর্বে যা ভক্ষণ করেছে, সে জন্য তাদের কোন গোনাহ্ নেই যখন ভবিষ্যতের জন্য সংযত হয়েছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেছে। এরপর সংযত থাকে এবং বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর সংযত থাকে এবং সৎকর্ম করে। আল্লাহ্ সৎকর্মীদেরকে ভালোবাসেন। (৯৪) হে মু'মিনগণ. আল্লাহ্ তোমাদেরকে এমন কিছু শিকারের মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন,

যে শিকার পর্যন্ত তোমাদের হাত ও বর্শা সহজেই পৌঁছতে পারবে—যাতে আল্লাহ্ বুঝতে পারেন যে, কে তাকে অদৃশ্যভাবে ভয় করে। অতএব, যে ব্যক্তি এরপর সীমা অতিক্রম করবে, তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) মু'মিনগণ, তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় শিকার বধ করো না। তোমাদের মধ্যে যে জেনেশুনে শিকার বধ করবে, তার উপর বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে। দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এর ফয়সালা করবে—বিনিময়ের জন্তুটি উৎসর্গ হিসাবে কা'বায় পৌঁছতে হবে অথবা তার উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব—কয়েকজন দরিদ্রকে খাওয়ানো অথবা তার সমপরিমাণ রোযা রাখবে, যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। যা হয়ে গেছে, তা আল্লাহ্ মাফ করেছেন। যে পুনরায় এ কাণ্ড করবে, আল্লাহ্ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবেন। আল্লাহ্ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম। (৯৬) তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে তোমাদের এবং মুসাফিরদের উপকারার্থে। আর তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে স্থলভাগের শিকার, যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাক। আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার কাছে তোমরা সমবেত হবে।

যোগসূত্র ঃ লুবাব গ্রন্থে মসনদে-আহমদ থেকে আবূ হোরায়রা (রা)-র রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত রয়েছে যে, পূর্বোক্ত আয়াতে যখন মদ ও জুয়ার অবৈধতা অবতীর্ণ হয়, তখন কিছু সংখ্যক সাহাবী আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! অনেক মদ্যপায়ী ও জুয়াড়ী মুসলমান এগুলো অবৈধ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। এখন জানা গেল যে, এগুলো হারাম। সুতরাং তাদের কি অবস্থা হবে? এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ---আয়াতখানি অবতীর্ণ হয়।

পূর্বোক্ত يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبَاتِ ... ---আয়াতে পবিত্র বস্তুকে হারাম করে নেওয়ার নিষেধাজ্ঞা উল্লিখিত ছিল। এখন يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ ---আয়াতে বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ণ ক্ষমতাবান। তিনি বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বস্তুকে হারাম করে দিতে পারেন। (বয়ানুল কোরআন)

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা যা ভক্ষণ করেছে, তজ্জন্য

তাদের কোন গোনাহ্ নেই ; যদি তখন তা হালাল থাকে ; পরে হারাম হয়ে গেলেও যখন (গোনাহ্র কোন কারণ নেই, তাদের গোনাহ্ কিরূপে হবে, বরং গোনাহ্র পরিপন্থী একটি বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। তা এই যে), তারা (আল্লাহ্র ভয়ে তখনকার অবৈধ বস্তুসমূহ থেকে) সংযত রয়েছে এবং (এ আল্লাহ্ভীতির প্রমাণ এই যে, তারা) বিশ্বাস স্থাপন করেছে (যা আল্লাহ্ভীতির কারণ) এবং সৎকর্ম করেছে (যা আল্লাহ্ভীতির লক্ষণ এবং তদবস্থায়ই তারা সারা জীবন অতিবাহিত করেছে। যদি সে হালাল বস্তু, যা তারা ভক্ষণ করত, পরে কোন সময় হারাম হয়ে যায়, তবে) অতঃপর (তা থেকেও সে আল্লাহ্-ভীতির কারণেই) সংযত হয়েছে এবং (এ আল্লাহ্ভীতির প্রমাণও আগের মত এই যে, তারা) বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং চমৎকার সৎকর্ম করেছে (যা বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং এখানেও আল্লাহ্ভীতির কারণ ও লক্ষণের সমাবেশ ঘটেছে। উদ্দেশ্য এই যে, যতবারই হারাম করা হয়েছে, ততবারই তাদের কর্মপন্থা এক হয়েছে---দু'তিন বারের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অতএব, পরিপন্থী এবং পরিপন্থীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা গোনাহ্গার হবে ---এমনটি আমার কৃপা থেকে অনেক দূরে।) এবং (তাদের এ বিশেষ ধরনের সৎকর্মশীলতা শুধু গোনাহ্ হওয়ারই পরিপন্থী নয়, বরং সওয়াব ও প্রিয়পাত্র হওয়ারও কারণ। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। (সুতরাং তারা ক্রোধের পাত্র হবে---তা কেমন করে সম্ভব ? তারা ক্রোধের পাত্র না হওয়ার সীমা অতিক্রম করে প্রিয়পাত্র হওয়ার সীমায় উন্নীত)।

হে বিশ্বাসিগণ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে এমন কিছু শিকার দ্বারা পরীক্ষা করবেন যে শিকার পর্যন্ত (দূরে পলায়ন না করার কারণে) তোমাদের হাত এবং তোমাদের বর্শা পৌঁছতে পারবে। (পরীক্ষার মর্ম এই যে, ইহ্রাম অবস্থায় বন্য জন্তুর শিকার তোমাদের জন্য হারাম করে, যা পরে বর্ণিত হবে---এসব বন্য জন্তুকে তোমাদের আশেপাশে হাতের কাছে ফেরানো হবে) যাতে আল্লাহ্ তা'আলা (বাহ্যতও) বুঝতে পারেন যে, কে তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর শাস্তিকে) অদৃশ্যভাবে ভয় করে (এবং হারাম কাজ থেকে---যা শাস্তির কারণ, বিরত থাকে ? এতে প্রসঙ্গক্রমে একথাও জানা গেল যে, এরূপ শিকার করা হারাম)। অতএব, যে এ উক্তির (অর্থাৎ হারাম করার) পর (পরীক্ষা দ্বারা যা বোঝা যায়---শরীয়তের) সীমা অতিক্রম করবে (অর্থাৎ নিষিদ্ধ শিকার করবে) তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (সেমতে শিকারী জন্তু আশেপাশে হাতের কাছে ঘোরাফিরা করতো। সাহাবীদের মধ্যে অনেকেই শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন এতে তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা হচ্ছিল। তারা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। অতঃপর নিষেধাজ্ঞা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হচ্ছে---) হে বিশ্বাসিগণ, তোমরা বন্য জন্তু (শরীয়ত বর্ণিত ব্যতিক্রম ছাড়া) শিকার করো না, যখন তোমরা ইহ্রাম অবস্থায় থাক (এমনিভাবে শিকারী জন্তু হেরেমের ভিতরে থাকলে তোমরা যদি ইহ্রাম অবস্থায় না-থাক, তবুও শিকার করো না) এবং তোমাদের মধ্যে যে জেনে-শুনে শিকার বধ করবে, তার উপর (এ কাজের) কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে, (যা মূল্যের দিক দিয়ে) সমান হবে ঐ জন্তুর, যাকে সে বধ করেছে---যার (অনুমানের) ফয়সালা তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি করবে (যারা ধার্মিকতায় এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানে নির্ভরযোগ্য হবে। মূল্য অনুমান করার পর বধকারীর ইচ্ছা---) হয় (এ মূল্যের এ ধরনের

কোন জন্তু ক্রয় করবে যে,) তা বিনিময় (অর্থাৎ বিনিময়ের জন্তু) বিশেষভাবে চতুষ্পদ জন্তু হবে (অর্থাৎ উট, গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, নর জাতীয় হোক বা মাদী) এই শর্তে যে, উৎসর্গ হিসাবে কা'বা (অর্থাৎ কা'বার নিকট) পর্যন্ত (অর্থাৎ হেরেমের সীমার ভিতরে) পৌঁছাতে হবে এবং না হয় (এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য) কাফ্ফারা (হিসাবে) দরিদ্রদেরকে দান করবে (অর্থাৎ একজন দরিদ্রকে একজনের ফিতরা পরিমাণ দেবে) এবং না হয় তার (অর্থাৎ খাদ্যশস্যের) সমপরিমাণ রোযা রাখবে (সমপরিমাণ এভাবে হবে যে, প্রত্যেক দরিদ্রের অংশ অর্থাৎ একজনের ফিতরার পরিবর্তে একটি রোযা রাখতে হবে। আর এ বিনিময় নির্ধারণের কারণ এই) যাতে সে স্বীয় কৃতকর্মের প্রতিফল আস্বাদন করে। (ঐ ব্যক্তির অবস্থা ভিন্ন, যে জেনেশুনে শিকার বধ করে না, যদিও তার উপরও এ বিনিময়ই ওয়াজিব কিন্তু তা তার কৃতকর্মের প্রতিফল নয়; বরং সম্মানিত স্থান অর্থাৎ হেরেমের এলাকায় শিকার যা হেরেম হওয়ার কারণে সম্মানিত কিংবা ইহ্‌রাম বাঁধার কারণে সম্মানিতের মত হয়ে গেছে, তার প্রতিফল। এ বিনিময় আদায় করার ক্ষেত্রে) যা অতীত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা তা ক্ষমা করেছেন এবং যে ব্যক্তি পুনরায় এরূপ কাজ করবে, (যেহেতু অধিকাংশ পুনরাবৃত্তিতে আগের তুলনায় অধিক নির্ভীকতা থাকে, এ কারণে উল্লিখিত বিনিময় ছাড়াও, যা কৃতকর্মের প্রতিফল কিংবা স্থানের প্রতিফল, পরকালে) আল্লাহ্ তা'আলা তার থেকে (এ নির্ভীকতার) প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। (তবে তওবা করলে এ প্রতিশোধের কারণ বাকী থাকবে না।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম। তোমাদের জন্য (ইহরাম অবস্থায়) সমুদ্রের (অর্থাৎ পানির) শিকার ধরা এবং তা ভক্ষণ করা (সবই) হালাল করা হয়েছে, তোমাদের (এবং তোমাদের) মুসাফিরদের (উপকারের) উপকারার্থ (যাতে সফরে একেই পাথেয় করে নিতে পারে)। আর স্থলভাগের শিকার (যদিও কোন কোন অবস্থায় ভক্ষণ করা বৈধ, কিন্তু,) ধরা (কিংবা তাতে সহায়তা করা) তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে, যে পর্যন্ত তোমরা ইহ্‌রাম অবস্থায় থাকবে। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় করবে, যার কাছে তোমাদেরকে সমবেত (করে উপস্থিত) করা হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ হেরেমের সীমার ভেতরে ইহরাম অবস্থায় যেসব শিকার হারাম, তা খাদ্য জাতীয় অর্থাৎ হালাল জন্তু হোক কিংবা অখাদ্য অর্থাৎ হারাম জন্তু হোক---সবই হারাম।

o বন্য জন্তুকে শিকার বলা হয়, যেগুলো প্রকৃতিগতভাবে মানুষের কাছে থাকে না। সুতরাং যেসব জন্তু সৃষ্টিগতভাবে গৃহপালিত; যেমন ভেড়া, ছাগল, গরু, উট---এগুলো জবাই করা এবং খাওয়া জায়েয।

o তবে যেসব জন্তু দলীলের ভিত্তিতে ব্যতিক্রমধর্মী, সেগুলোকে ধরা এবং বধ করা হালাল। যেমন, সামুদ্রিক জন্তু শিকার। দলীল এই ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে)। কিছুসংখ্যক স্থলভাগের জন্তু যেমন,

কাক, চিল, বাঘ, সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর---প্রভৃতি বধ করাও হালাল। এমনিভাবে যে হিংস্র জন্তু আক্রমণ করে, সেটিকে বধ করাও হালাল। হাদীসে এগুলোর ব্যতিক্রম উল্লেখিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, الصيد শব্দের মধ্যে ব্যবহৃত الف لام عهدى,

০ যে হালাল জন্তু ইহ্‌রাম ছাড়া অবস্থায় এবং হেরেমের বাইরে শিকার করা হয়, ইহ্‌রামওয়ালা ব্যক্তির পক্ষে তা খাওয়া জায়েয। যদি সে জন্তুকে শিকার করা ও বধ করার কাজে সে নিজে সহায়ক কিংবা পরামর্শদাতা কিংবা জন্তুর প্রতি ইঙ্গিতকারী না হয়। হাদীসে তাই বলা হয়েছে এবং আয়াতের لَا تَقْتُلُوا শব্দেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, আয়াতে لا تقتلوا (বধ করো না) বলা হয়েছে--- لا تاكلوا (খেয়ো না) বলা হয়নি।

০ হেরেমের এলাকায় প্রাপ্ত শিকারকে জেনেশুনে বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে ভুলক্রমে বা অজান্তে বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব। (রূহুল মা'আনী)

০ প্রথম বার বধ করলে যেমন বিনিময় ওয়াজিব, এমনিভাবে দ্বিতীয়-তৃতীয় বার বধ করলেও বিনিময় ওয়াজিব হয়ে থাকে।

০ বিনিময়ের সারমর্ম এই যে, যে সময়ে এবং যে স্থানে জন্তুকে বধ করা হয়, উত্তম এই যে, দু'জন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারা (একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি দ্বারাও জায়েয) জন্তুর মূল্য অনুমান করাতে হবে। যদি নিহত জন্তু খাবার অযোগ্য (অর্থাৎ হারাম) হয়, তবে এর মূল্য একটি ছাগলের মূল্যের চাইতে বেশী ওয়াজিব হবে না। আর যদি জন্তুটি খাবার যোগ্য (অর্থাৎ হালাল) হয়, তবে যে পরিমাণ মূল্য অনুমান করা হবে তাই ওয়াজিব হবে। উভয় অবস্থায় পরবর্তীতে তিনটি কাজের মধ্য থেকে সে যে-কোন একটি করতে পারে। হয় এ মূল্যের দ্বারা কুরবানীর শর্তানুযায়ী কোন জন্তু ক্রয় করে হেরেমের সীমানার ভেতরে তা জবাই করে গোশত ফকীরদের মধ্যে বন্টন করে দেবে, না হয় এ মূল্যের সমপরিমাণ খাদ্যশস্য ফিতরার শর্তানুযায়ী প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা' হিসাবে দান করে দেবে এবং না হয় সে খাদ্য-শস্য অর্ধ ছা হিসাবে যতজনকে দেওয়া যেত, তত সংখ্যক রোযা রাখবে। খাদ্যশস্য বন্টন এবং রোযা রাখা হেরেমের ভেতরে হওয়া শর্ত নয়। যদি অনুমান কৃত মূল্য অর্ধ ছা' থেকেও কম হয়, তবে ইচ্ছা করলে তা একজন ফকীরকে দিয়ে দিতে পারবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখতে পারবে। এমনিভাবে প্রতি মিসকীনকে অর্ধ ছা হিসাবে দেওয়ার পর যদি অর্ধ ছা' থেকে কম অবশিষ্ট থাকে, তবুও ইচ্ছা করলে তা এক মিসকীনকে দিয়ে দেবে কিংবা ইচ্ছা করলে একটি রোযা রাখবে। আমাদের দেশে প্রচলিত ওজন অনুযায়ী অর্ধ ছা' পৌনে দু'সেরের সমান।

০ উল্লিখিত অনুমানে যতজন মিসকীনের অংশ সাব্যস্ত হয়, যদি তাদেরকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করিয়ে দেয় তবে তাও জায়েয।

০ যদি এ মূল্য দিয়ে যবেহ্ করার জন্য জন্তু ক্রয় করার পর কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়, তবে উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে ইচ্ছা করলে অন্য জন্তু ক্রয় করতে পারবে কিংবা খাদ্যশস্য ক্রয় করতে

পারবে কিংবা খাদ্যশস্যের হিসাবে রোযা রাখতে পারবে। জন্তু বধ করলে যেমন বিনিময়ে ওয়াজিব হয়, তেমনিভাবে জন্তুকে আহত করলেও অনুমান করতে হবে যে, এ আঘাতের ফলে জন্তুটির কতটুকু মূল্য হ্রাস পেয়েছে। অতঃপর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য দিয়ে পূর্বোক্ত তিনটি কাজের যে-কোন একটি কাজ করা জায়েয হবে।

o ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যে জন্তু শিকার করা হারাম সে জন্তুকে যবেহ করাও হারাম। তার যবেহ্‌কৃত জীবটি মৃত বলে গণ্য হবে। لا تقتلوا বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইহ্‌রাম বাঁধা ব্যক্তির পক্ষে যবেহ্ করা বধ করারই অনুরূপ।

o যদি কোন অনাবাদী জায়গায় জন্তু বধ করা হয়, তবে নিকটতম জনবসতির বাজার দর হিসাবে মূল্য অনুমান করতে হবে।

o শিকার কাজের জন্য ইঙ্গিত-ইশারা করা, বলে দেওয়া এবং সাহায্য করাও শিকার করার মতই হারাম।

جَعَلَ اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيٰمًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ
وَالْهَدْيَ وَالْقَلَآئِدَ ۭ ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ مَا عَلَي الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۭ وَاللّٰهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ۝ قُلْ لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ
اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

(৯৭) আল্লাহ্ সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ করেছেন এবং সম্মানিত মাসসমূহকে, হেরেমে কুরবানীর জন্তুকেও যেগুলির গলায় বিশেষ ধরনের বেড়ী পরানো রয়েছে; এর কারণ এই যে, যাতে তোমরা জেনে নাও যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সবকিছু জানেন এবং আল্লাহ্ সব বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (৯৮) জেনে নাও, নিশ্চয় আল্লাহ্ কঠোর শাস্তিদাতা ও নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল—দয়ালু। (৯৯) রসূলের দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া। আল্লাহ্ জানেন, যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে কর এবং যা কিছু গোপনে কর। (১০০) বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের প্রাচুর্য তোমাকে বিস্মিত করে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর—যাতে তোমরা সফলতা লাভ করতে পার।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আল্লাহ্ তা'আলা সম্মানিত গৃহ কা'বাকে মানুষের কায়েম থাকার জন্য কল্যাণময় স্থিতিশীলতার কারণ বানিয়েছেন এবং (এমনিভাবে) সম্মানিত মাসসমূহকেও এবং (এমনিভাবে) হেরেমের কুরবানীর জন্তুদেরকেও এবং (এমনিভাবে) ঐসব জন্তুকেও, যাদের গলায় (একথা বোঝাবার জন্য) আভরণ থাকে যে, (এগুলো আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত এবং হেরেমে যবেহ্ করা হবে) এ (সিদ্ধান্ত অন্যান্য জাগতিক উপযোগিতা ছাড়াও ধর্মীয় উপযোগিতার) কারণে (ও) যাতে (তোমাদের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ও পাকাপোক্ত হয়; এভাবে যে, তোমরা এসব কল্যাণকর দলীলের ভিত্তিতে) এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস প্রথমত ও পূর্ণত অর্জন কর যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অন্তর্নিহিত সব বস্তুর (পূর্ণ) জ্ঞান রাখেন। (কেননা, মানুষের কল্পনাতীত ভবিষ্যৎ মঙ্গল ও উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধি-বিধান প্রণয়ন করা পরিপূর্ণ জ্ঞানেরই পরিচায়ক)। এবং (যাতে এসব জানা বিষয়ের সাথে জ্ঞানের সম্পর্কের যুক্তিতে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন কর যে,) নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। (কেননা, এসব জানা বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কে আর কেউ অবহিত করেনি। জানা গেল যে, জ্ঞানের সম্বন্ধ সব জানা বস্তুর সাথে একই রূপ হয়ে থাকে।) তোমরা নিশ্চিত জেনো যে, আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং তিনি পরম ক্ষমাশীল, করুণাময়। (অতএব, তাঁর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করো না। মাঝে মাঝে হয়ে গেলে শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তওবা করে নাও।) রসূল (সা)-এর দায়িত্ব শুধু পৌঁছিয়ে দেওয়া (তিনি যথার্থভাবে পৌঁছিয়েছেন। এখন তোমাদের কাছে কোন ওযর ও বাহানা নেই) এবং আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয় পরিজ্ঞাত রয়েছেন যা কিছু তোমরা (মুখে কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা) প্রকাশ কর এবং যা কিছু (অন্তরে) গোপন রাখ। (অতএব, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তর উভয়টির মাধ্যমে তোমাদের আনুগত্য করা উচিত)। আপনি (হে মুহাম্মদ [সা], তাদেরকে একথাও) বলে দিন ঃ অপবিত্র ও পবিত্র (অর্থাৎ গোনাহ্ ও আনুগত্য কিংবা গোনাহ্গার ও আনুগত্যশীল ব্যক্তি) সমান নয়, (বরং অপবিত্র ঘৃণার্হ এবং পবিত্র গ্রহণীয়। সুতরাং আনুগত্য করে গ্রহণীয় হওয়া উচিত; অবাধ্যতা করে ঘৃণার্হ হওয়া উচিত নয়)। যদিও (হে দর্শক,) তোমাকে অপবিত্রের প্রাচুর্য (যেমন দুনিয়াতে অধিকাংশ এমনই হয়) বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয় (যে, ঘৃণার্হ হওয়া সত্ত্বেও এর এত প্রাচুর্য কেন! কিন্তু জেনে রেখো কোন রহস্যের কারণে যে প্রাচুর্য, তা প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণ নয়। সেটা যখন প্রাচুর্যের উপর ভিত্তিশীল নয় কিংবা যখন তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান ও শাস্তির কথা জানতে পারলে।) অতএব হে বুদ্ধিমানগণ, (একে দেখো না বরং) আল্লাহ্ তা'আলাকে (অর্থাৎ তাঁর বিরুদ্ধাচরণকে) ভয় করতে থাক যেন তোমরা (পরিপূর্ণ) সফলতা লাভ করতে পার (তা হচ্ছে জান্নাত লাভ ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শান্তির চারটি উপায় ঃ প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা চারটি বস্তুকে মানুষের প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব ও শান্তির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমত কা'বা। আরবী ভাষায় কা'বা চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৃহকে বলা হয়। আরবে 'খাস্‌আম' গোত্রের নির্মিত অপর একটি গৃহও এ নামে খ্যাত ছিল। সে গৃহকে 'কা'বা-ইয়ামানিয়াহ্' বলা হত। তাই বায়তুল্লাহ্‌কে সে কা'বা থেকে স্বতন্ত্র করে বোঝাবার জন্য কা'বা শব্দের সাথে البيت الحرام শব্দ যোগ করা হয়েছে।

اسم مصدر قوام ও قيام শব্দটি ---এর অর্থ ঐ সব বস্তু যার উপর কোন বস্তুর স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। তাই قِيَامًا لِّلنَّاسِ-এর অর্থ হবে এই যে, কা'বা ও তৎ-সম্পর্কিত বস্তুসমূহ মানুষের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের কারণ এবং উপায়।

ناس শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এক্ষেত্রে স্থানের ইঙ্গিতে বিশেষভাবে মক্কার লোকজন কিংবা আরববাসী কিংবা সমগ্র বিশ্বের মানুষকেও বোঝা যেতে পারে। বাহ্যত সমগ্র বিশ্বের মানুষই এর অন্তর্ভুক্ত। তবে মক্কা ও আরববাসীদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কাজেই আয়াতের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কা'বা তথা বায়তুল্লাহ্‌কে এবং পরবর্তীতে উল্লিখিত আরও কতিপয় বস্তুকে সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও স্থিতিশীলতার উপায় করে দিয়েছেন। যতদিন পর্যন্ত জগতের প্রতি দেশ ও অঞ্চলের মানুষ বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে থাকবে এবং হজ্বব্রত পালন করতে থাকবে অর্থাৎ যাদের উপর হজ্ব ফরয তারা হজ্ব করতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত ও সংরক্ষিত থাকবে। পক্ষান্তরে যদি এক বছরকালও হজ্বব্রত পালন না করে কিংবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ করে কেউ নামায আদায় না করে, তবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক আযাব নেমে আসবে।

কা'বা সমগ্র বিশ্বের স্তম্ভ ঃ এ বিষয়বস্তুটি তফসীরবিদ হযরত আতা (র) এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ لو تركوه عامًا واحدا لم ينظروا ولم يؤخروا (বাহ্‌রে-মুহীত)---। এতে বোঝা গেল যে, তাৎপর্যগতভাবে খানায়ে-কা'বা সমগ্র বিশ্বের জন্য স্তম্ভ বিশেষ। যতদিন এর দিকে মুখ করা হবে এবং হজ্ব পালিত হতে থাকবে, ততদিনই জগত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যদি কোন সময় বায়তুল্লাহ্‌র এ সম্মান বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে বিশ্বকেও বিলীন করে দেওয়া হবে। বিশ্বের ব্যবস্থাপনা ও বায়তুল্লাহ্‌র মাঝে যে যোগসূত্র রয়েছে, তার স্বরূপ জানা জরুরী নয়। যেমন, চুম্বক লোহা এবং বিশেষ প্রকারের আঠা ও খড়কুটোর পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ কেউ জানে না। কিন্তু এটি এমন একটি বাস্তব সত্য, যা চোখেই দেখা যায়, কেউ একে অস্বীকার করতে পারে না। বায়তুল্লাহ্ ও বিশ্ব ব্যবস্থাপনার পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা মানুষের সাধ্যাতীত। বিশ্ব-স্রষ্টার বর্ণনার মাধ্যমেই তা জানা যায়। বায়তুল্লাহ্‌র সমগ্র বিশ্বের স্থায়িত্বের কারণ হওয়া একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। বাহ্যিক দৃষ্টি তা অনুভব করতে পারে না, কিন্তু আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য এটি যে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ, তা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও চাক্ষুষ জ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত।

বায়তুল্লাহ্‌র অস্তিত্ব বিশ্ব শান্তির কারণ ঃ সাধারণত বিশ্বে রাষ্ট্রীয় আইন প্রয়োগের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব কারণে ডাকাত, চোর, লুণ্ঠনকারীরা দুঃসাহস করতে

পারে না। কিন্তু জাহিলিয়াত যুগের আরবে কোন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিংবা জননিরাপত্তার জন্য কোন নিয়মিত আইনও প্রচলিত ছিল না। গোত্রীয় কাঠামোতেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এক গোত্র অন্য গোত্রের জানমাল ও মান-সম্ভ্রমের উপর যখন ইচ্ছা আক্রমণ করতে পারত। কাজেই কোন গোত্রের পক্ষে কখনও শান্তি ও নিরাপত্তার সুযোগ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পরিপূর্ণ কুদরতের বলে মক্কার বায়তুল্লাহ্কে রাষ্ট্রের স্থলাভিষিক্ত করে শান্তির উপায় করে দেন। রাষ্ট্রীয় আইনের বিরুদ্ধাচরণ করার মত ধৃষ্টতা যেমন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি করতে পারে না, বায়তুল্লাহ্ শরীফের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার সাহসও তেমনিভাবে কেউ করতে পারত না। আল্লাহ্ তা'আলা জাহিলিয়াত যুগে বায়তুল্লাহ্ শরীফের সম্মান ও মাহাত্ম্য সাধারণ মানুষের অন্তরে এমনভাবে সংস্থাপিত করে দেন যে, তারা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যাবতীয় ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তিকে বর্জন করতেও কুণ্ঠিত হত না।

সে যুগের আরবদের রণোন্মাদনা ও গোত্রগত বিদ্বেষ সারা বিশ্বে প্রবাদ বাক্যের মত খ্যাত ছিল। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে বায়তুল্লাহ্ ও তার আনুষঙ্গিক বস্তু-সামগ্রীর সম্মান ও মাহাত্ম্য এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন যে, প্রাণের ঘোরতর শত্রু কিংবা কঠোরতর অপরাধীও যদি একবার হেরেম শরীফের সীমানায় আশ্রয় নিতে পারত, তবে তার সাত খুন মাফ হয়ে যেত। তারা তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধ সত্ত্বেও তাকে কিছুই বলত না। হেরেমের অভ্যন্তরে পিতৃহন্তাকে চোখের সামনে দেখেও তারা চক্ষু নত করে চলে যেত।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি হজ্ব ও ওমরার নিয়তে বাড়ী থেকে বের হত কিংবা যে জন্তু হেরেম শরীফে কুরবানীর জন্য আনা হত, তার প্রতিও আরবরা সম্মান প্রদর্শন করত এবং কোন অতি মন্দ ব্যক্তিও এর ক্ষতি করত না। হজ্ব ও ওমরার কোন লক্ষণ কিংবা কণ্ঠাভরণ বাঁধা অবস্থায় কোন প্রাণের শত্রুকেও তারা কিছুই বলত না।

ষষ্ঠ হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা) একদল সাহাবায়ে কিরামকে সাথে করে ওমরার ইহ্রাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশে রওয়ানা হন। হেরেম শরীফের সীমানার সন্নিকটে হোদায়বিয়া নামক স্থানে তিনি যাত্রাবিরতি করেন এবং হযরত ওসমান (রা)-কে কয়েকজন সঙ্গীসহ মক্কায় পাঠিয়ে দেন, যাতে তাঁরা মক্কার সর্দারদেরকে বলে দেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধের নিয়তে নয়---ওমরা আদায় করার জন্য এসেছেন। কাজেই তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা উচিত হবে না।

কোরাইশ সর্দাররা অনেক আলাপ-আলোচনার পর মহানবী (সা)-র খিদমতে একজন প্রতিনিধি পাঠায়। এ প্রতিনিধিকে দেখা মাত্রই মহানবী (সা)-বললেন, লোকটিকে বায়তুল্লাহ্র সম্মান সম্ভ্রমে গভীর বিশ্বাসী বলে মনে হয়। কাজেই চিহ্নযুক্ত কুরবানীর জন্তুগুলোকে দেখে সে নির্দ্বিধায় স্বীকার করল যে, মুসলমানদেরকে বায়তুল্লাহ্ গমনে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

মোট কথা, জাহিলিয়াত যুগেও আল্লাহ্ তা'আলা আরবদের মনে হেরেম শরীফের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা অব্যাহত ছিল। এ সম্মানের ফলশ্রুতিতে শুধু হেরেম শরীফের ভেতরে যাতায়াতকারী লোকজন এবং বিশেষ চিহ্ন পরিহিত অবস্থায় হজ্ব ও ওমরার জন্য আগমনকারীরা নিরাপদ হয়ে যেত বটে, কিন্তু বহির্বিশ্বের লোকজন এদ্বারা কোন উপকার, শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জন করতে পারত না। কিন্তু আরবে যেভাবে

বায়তুল্লাহ্ ও হেরেম শরীফের সম্মান ব্যাপকভাবে প্রতিপালিত হতো, তেমনিভাবে হজ্বের মাসগুলোর প্রতিও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করা হত। আরবরা এ মাসগুলোকে 'আসহুরে হুরুম' বা সম্মানিত মাস বলত। কেউ কেউ এগুলোর সাথে রজব মাসকেও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। এসব মাসে হেরেমের বাইরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করাকেও আরবরা হারাম মনে করত এবং এ থেকে সযত্নে বেঁচে থাকত।

এ কারণে কোরআন পাক মানুষের স্থায়িত্বের উপায় হিসাবে কা'বার সাথে আরও তিনটি বস্তুর উল্লেখ করেছে ঃ প্রথমত اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ অর্থাৎ সম্মান ও মহত্বের মাস। এখানে شهر শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধারণ তফসীরবিদগণ বলেছেন যে, এখানে شهر حرام বলে যিলহজ্ব মাসকে বোঝানো হয়েছে। এ মাসেই হজ্বের ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন হয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, শব্দটি একবচন হলেও অর্থের দিক দিয়ে جنس হওয়ার কারণে অন্যান্য সম্মানিত মাসও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় বস্তু হচ্ছে هدى হেরেম শরীফে যে জন্তুকে কুরবানী করা হয়, তাকে هدى বলা হয়। যে ব্যক্তির সাথে এরূপ জন্তু থাকত, সে নির্বিবাদে পথ চলতে পারত, তাকে কেউ কিছু বলত না। এভাবে কুরবানীর জন্তুও ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অন্যতম উপায়।

তৃতীয় বস্তু قَلَائِدُ।—এটি قِلَادَةٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ গলার হার। জাহিলিয়াত যুগের আরবে প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কেউ হজ্বের উদ্দেশে বের হলে চিহ্নস্বরূপ গলায় একটি হার পরে নিত, যাতে একে দেখে সবাই বুঝতে পারে যে, লোকটি হজ্ব করতে যাচ্ছে, ফলে কেউ যেন তাকে কোন কষ্ট না দেয়। কুরবানীর জন্তুর গলায়ও এ ধরনের হার পরিয়ে দেওয়া হত। এসব হারকেও قلائد বলা হয়। এর কারণে قلائد-ও শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপায় হয়ে যায়।

চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, সম্মানিত মাসসমূহ কুরবানীর জন্তু এবং গলার হার এ তিনটি বস্তুই বায়তুল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত। এদের সম্মানও বায়তুল্লাহ্‌র সম্মানেরই একেকটি অংশ। সার কথা এই যে, বায়তুলল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য সাধারণভাবে এবং আরব ও মক্কাবাসীদের জন্য বিশেষভাবে স্থায়িত্বের উপায় করে দিয়েছেন।

قِيَامًا لِّلنَّاسِ-এর ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ বলেছেন, এর অর্থ এই যে, বায়তুল্লাহ্ ও হেরেমকে সবার জন্য শান্তির আবাসস্থল করা হয়েছে। কেউ বলেছেন, এর অর্থ হচ্ছে মক্কাবাসীদের জন্য রুযী-রোজগারের সুবিধা দান। কেননা, এখানে কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সারা বিশ্বের জিনিসপত্র এখানে পৌঁছিয়ে দেন।

কেউ বলেন, মক্কাবাসীরা যেহেতু কা'বাগৃহের খাদেম ও সংরক্ষক বলে পরিচিত ছিল, তাই তাদেরকে আল্লাহ্ ভক্ত মনে করে সর্বদা মানুষ তাদের সম্মান করত। قِيَامًا لِّلنَّاسِ বাক্যে তাদের এ বিশেষ সম্মানকেই বোঝানো হয়েছে।

ইমাম আবদুল্লাহ্ রাযী (র) বলেন, এসব উক্তির মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। এসবগুলোই উপরোক্ত বাক্যের উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বায়তুল্লাহ্কে সব মানুষের স্থায়িত্ব, ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল ও সাফল্যের উপায় করেছেন এবং আরব ও মক্কাবাসীদের বিশেষভাবে এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মঙ্গল ও বরকত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ আমি বায়তুল্লাহ্ ও তৎসম্পর্কিত বস্তুসমূহকে মানুষের জন্য স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তার উপায় করেছি। আরববাসীরা বিশেষভাবে এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করে থাকে। এটা এজন্য বলা হয়েছে যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলের যাবতীয় বিষয় যথাযথভাবে জানেন এবং তিনিই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -অর্থাৎ জেনে রাখ, আল্লাহ্ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা এবং আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়। এতে বলা হয়েছে যে, হালাল ও হারামের যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো পালন করার মধ্যেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। পক্ষান্তরে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণ করা কঠোর শাস্তির কারণ। সাথে সাথে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, মানবীয় ভুলভ্রান্তি ও ঔদাসীন্যের কারণে কোন গোনাহ হয়ে গেলে আল্লাহ্ তা'আলা তৎক্ষণাৎ শাস্তি দেন না বরং তওবাকারী অনুতপ্ত লোকদের জন্য ক্ষমার দ্বারও উন্মুক্ত রাখেন।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلَاغُ ۝ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ

অর্থাৎ আমার রসূলের দায়িত্ব এতটুকুই যে, তিনি আমার নির্দেশাবলী মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এরপর তা মানা না মানার লাভ ও ক্ষতি তারাই ভোগ করবে ; তারা না মানলে

আমার রসূলের কোনই ক্ষতি নেই। একথাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। তিনি তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন---সব কাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ---আরবী ভাষায় طيب ও خبيث দু'টি বিপরীত শব্দ। প্রত্যেক উৎকৃষ্ট বস্তুকে طيب এবং প্রত্যেক নিকৃষ্ট বস্তুকে خبيث বলা হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে আয়াতে خبيث শব্দ দ্বারা হারাম ও অপবিত্র এবং طيب শব্দ দ্বারা হালাল ও পবিত্র বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে বরং প্রত্যেক সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকের দৃষ্টিতেও পবিত্র ও অপবিত্র এবং হালাল ও হারাম সমান হতে পারে না।

এক্ষেত্রে طيب ও خبيث শব্দ দু'টি স্বীয় ব্যাপকতার দিক দিয়ে হালাল ও হারাম অর্থ-সম্পদ, উত্তম ও অধম মানুষ এবং ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্রকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আয়াতের সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, কোন সুস্থ বিবেকবানের দৃষ্টিতে সৎ ও অসৎ এবং ভাল ও মন্দ সমান নয়। এ স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'আলার কাছে হালাল ও হারাম কিংবা পবিত্র ও অপবিত্র বস্তু সমান নয়। এমনিভাবে ভাল ও মন্দ কাজকর্ম ও চরিত্র এবং সৎ ও অসৎ লোকও সমান নয়।

অতঃপর বলা হয়েছে ঃ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ অর্থাৎ যদিও মাঝে মাঝে মন্দ ও অনুৎকৃষ্ট বস্তুর প্রাচুর্য দর্শকদেরকে বিস্মিত করে দেয় এবং আশেপাশে মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর ব্যাপক প্রসারের কারণে সেগুলোকেই ভাল বলে মনে করতে থাকে, কিন্তু আসলে এটি মানুষের অবচেতন মনের একটি রোগ এবং অনুভূতির ত্রুটি বিশেষ।

আয়াতের শানে নযুল ঃ এ আয়াতের শানে নযুল সম্পর্কে কোন কোন রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি মদের ব্যবসা করত এবং এ পথে বেশ অর্থ-সম্পদও উপার্জন করেছিল। ইসলামে মদ্যপান ও মদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়ে গেলে সে লোক মহানবী (সা)-র কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! মদের ব্যবসা দ্বারা সঞ্চিত যেসব টাকা-পয়সা আমার কাছে রয়েছে, সেগুলো কোন সৎকাজে ব্যয় করে দিলে আমার জন্য উপকার হবে কি? মহানবী (সা) বললেন, যদি তুমি এসব টাকা-পয়সা হজ্ব, জিহাদ ইত্যাদি কাজেও ব্যয় কর, তবুও তা আল্লাহ্র কাছে মাছির ডানার সমানও মূল্যবান হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।

এ হচ্ছে পরকালের দিক দিয়ে হারাম মালের অমর্যাদা। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এবং প্রত্যেক কাজের শেষ পরিণতিকে সামনে রাখলে বোঝা যায় যে, জগতের কাজ-কারবারেও হারাম ও হালাল মাল সমান নয়। হালাল মাল দ্বারা যতটুকু উপকার, সুফল এবং সত্যিকার সুখ-শান্তি লাভ করা যায়, হারাম মাল দ্বারা তা কখনও লাভ করা যায় না।

তফসীর দুররে-মনসূরে ইবনে আবী-হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত আছে যে,

তাবেয়ীদের যমানার খলীফায়ে-রাশেদ হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ পূর্ববর্তী খলীফাদের আরোপিত অবৈধ কর রহিত করে দেন এবং যাদের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে অর্থ-কড়ি আদায় করা হয়েছিল, তা সবই ফেরত দিয়ে দেন। ফলে সরকারী ধনাগার শূন্য হয়ে যায় এবং আমদানী সীমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা দেখে জনৈক প্রাদেশিক গভর্নর খলীফার কাছে পত্র লিখলেন যে, সরকারী আমদানী অনেক হ্রাস পেয়েছে। এখন সরকারী কাজ-কারবার কিভাবে চলবে, তা-ই চিন্তার বিষয়। খলীফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ উত্তরে আলোচ্য لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ --আয়াতটি লিখে অতঃপর লিখলেন ঃ তোমার পূর্ববর্তী গভর্নররা অন্যায় ও অত্যাচারের মাধ্যমে ধনাগার যতটুকু পূর্ণ করেছিল, তুমি এর বিপরীতে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে স্বীয় ধনাগারকে ততটুকু হ্রাস করে নাও এবং কোন পরওয়া করো না। আমাদের সরকারী কাজ-কর্ম টাকা-পয়সা দিয়েই পূর্ণ হবে।

আলোচ্য আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হলেও এর ব্যাপক অর্থ এই যে, সংখ্যার কমবেশী কোন বিষয় নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও সংখ্যাল্পতা দ্বারা কোন বস্তুর ভালমন্দ যাচাই করা যায় না। মাথার উপর হাত গণনা করে ৫১ হাতকে ৪৯ হাতের বিপক্ষে সত্য ও সত্যবাদিতার মাপকাঠি বলা যায় না।

বরং জগতের সকল স্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভাল বিষয়ের পরিমাণ ও সংখ্যা কম এবং মন্দ বিষয়ের সংখ্যা অধিক। ঈমানের বিপরীতে কুফর ; আল্লাহ্‌ভীতি, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার বিপরীতে পাপাচার ও অন্যায়াচরণ ; ন্যায় ও সুবিচারের বিপরীতে জুলুম ও উৎপীড়ন, জ্ঞানের বিপরীতে অজ্ঞানতা এবং সুবুদ্ধির বিপরীতে কুবুদ্ধির প্রাচুর্য বিদ্যমান। এতে এরূপ বিশ্বাসই অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, কোন বস্তু কিংবা কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সে বস্তু বা দলের ভাল ও সত্যপন্থী হওয়ার প্রমাণ কিছুতেই হতে পারে না। বরং কোন বস্তুর উৎকৃষ্টতা ব্যক্তিগত অবস্থা ও হাল-হকীকতের উপরই তা নির্ভরশীল। অবস্থা ও হাল-হাকীকত ভাল হলে বস্তুটি ভাল ; নতুবা মন্দ। কোরআন পাক এ সত্যটিই وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ বাক্যে ফুটিয়ে তুলেছে।

অবশ্য ইসলামও কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাধিক্যকে চূড়ান্ত মীমাংসা সাব্যস্ত করেছে। তবে তা ঐসব ক্ষেত্রেই, যেখানে যুক্তির সারবত্তা ও ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাচাই করার মত কোন ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা বিদ্যমান নেই। এক্ষেত্রে জনগণের বিবাদ-বিসম্বাদ নিষ্পত্তির জন্য সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। উদাহরণত গভর্নর নিযুক্তির প্রশ্নে যদি কোন নিরঙ্কুশ ক্ষমতাশালী শাসনকর্তার অভাবে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে জনগণের মতানৈক্য পরিহারের লক্ষ্যে সংখ্যাধিক্যকেই অগ্রগণ্য মনে করা হয়। এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে, অধিক সংখ্যক লোক যে কাজ করবে, তাই হালাল, বৈধ ও সত্য হবে।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ —অর্থাৎ

হে জ্ঞানবানগণ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন বস্তুর সংখ্যাধিক্য কামনা করা কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে সংখ্যালঘুতার বিপরীতে সত্যের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা বুদ্ধিমানদের কাজ নয়। তাই বুদ্ধিমানদেরকে সম্বোধন করে এ ভ্রান্ত কর্মপন্থা থেকে বিরত রাখার জন্য فَاتَّقُوا اللَّهَ আদেশ দেওয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ۚ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ ۚ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

(১০১) হে মু'মিনগণ! এমন কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না, যা তোমাদের কাছে পরিব্যক্ত হলে তোমাদের খারাপ লাগবে। যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব বিষয় জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্য প্রকাশ করা হবে। অতীত বিষয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেছেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, সহনশীল। (১০২) এরূপ কথাবার্তা তোমাদের পূর্বে এক সম্প্রদায় জিজ্ঞেস করেছিল। এরপর তারা এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী হয়ে গেল। (১০৩) আল্লাহ্ 'বহিরা', 'সায়েবা', 'ওছীলা' এবং 'হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি। কিন্তু যারা কাফির, তারা আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের অধিকাংশেরই বিবেক-বুদ্ধি নেই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! এমন (অনর্থক) কথাবার্তা জিজ্ঞেস করো না (যাতে এমন সম্ভাবনা রয়েছে যে), যদি তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হয়, তবে তোমাদের কষ্টের কারণ হবে (অর্থাৎ এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, উত্তর তোমাদের মনোবাঞ্ছনার বিপরীতে হওয়ার ফলে তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হবে) এবং (যেসব কথাবার্তায় এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে যে,) যদি কোরআন অবতরণকালে তোমরা এসব কথাবার্তা জিজ্ঞেস কর, তবে তা তোমাদের জন্য পরিব্যক্ত করা হবে (অর্থাৎ প্রশ্ন করার মধ্যে এ দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিও রয়েছে যে, উত্তর ব্যক্ত করা হবে এবং উত্তর ব্যক্ত করার মধ্যে প্রথমোক্ত সম্ভাবনাও রয়েছে যে, তোমাদের পক্ষে তা কষ্টকর হবে। এতদুভয় সম্ভাবনাই সমষ্টিগতভাবে প্রশ্ন করতে নিষেধ করার

কারণ এবং সম্ভাবনাদ্বয় বাস্তব। সুতরাং এরূপ প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ।) অতীত প্রশ্নাবলী (যা এ পর্যন্ত তোমরা করেছ, তা) আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করেছেন (কিন্তু ভবিষ্যতে আর এমন করো না।) এবং আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, (তাই অতীত প্রশ্নাবলী ক্ষমা করেছেন এবং) অত্যন্ত সহিষ্ণু---(তাই ভবিষ্যতের বিরুদ্ধাচরণ হেতু ইহকালে শাস্তি না দিলে মনে করো না যে, পরকালেও শাস্তি হবে না) এমন কথা তোমাদের পূর্বে (অর্থাৎ পূর্বকালে) অন্য উম্মতের লোকেরাও (নিজেদের পয়গম্বরগণকে) জিজ্ঞেস করেছিল, এরপর (উত্তর পেয়ে) এগুলোর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করেনি। (অর্থাৎ বিধি-বিধান সম্পর্কিত এসব উত্তর অনুযায়ী তারা কাজ করেনি এবং যেসব উত্তর বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত ছিল, সেগুলো থেকে উপদেশ গ্রহণ করেনি। সুতরাং তোমরাও যাতে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়ে পড়, এজন্য এ ধরনের প্রশ্ন না করাই উত্তম।) আল্লাহ্ তা'আলা 'বহীরা', 'সায়েবা', 'ওছীলা' এবং 'হামী'কে শরীয়তসিদ্ধ করেন নি, কিন্তু যারা কাফির, তারা (এসব কুপ্রথার ব্যাপারে) আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যারোপ করে (যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব কর্মে সন্তুষ্ট) এবং অধিকাংশ কাফির (ধর্মীয়) বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী নয় (এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না, বরং তাদের বড়দের দেখাদেখি এহেন মূর্খজনোচিত কাজ করে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

অনাবশ্যক প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ ঃ আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্র বিধি-বিধানে অনাবশ্যক চুলচেরা ঘাঁটাঘাঁটি করতে আগ্রহী হয়ে থাকে এবং যেসব বিধান দেওয়া হয়নি, সেগুলো নিয়ে বিনা প্রয়োজনে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন তুলতে থাকে। আয়াতে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন এরূপ প্রশ্ন না করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা কষ্টে পতিত হবে কিংবা গোপন রহস্য ফাঁস হওয়ার কারণে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে।

শানে নযুল ঃ মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েত অনুযায়ী আলোচ্য আয়াতসমূহের শানে-নযুল এই যে, যখন হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কিত আদেশ অবতীর্ণ হয়, তখন আকরা ইবনে হারেস (রা) প্রশ্ন করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের জন্য কি প্রতি বছরই হজ্জ করা ফরয? রসূলুল্লাহ্ (সা) এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। প্রশ্নকারী পুনর্বার প্রশ্ন করলেন। তিনি তবুও চুপ। প্রশ্নকারী তৃতীয়বার প্রশ্ন করলে তিনি শাসনের সুরে বললেন ঃ যদি আমি তোমার উত্তরে বলে দিতাম যে, হ্যাঁ, প্রতি বছরই হজ্জ ফরয, তবে তাই হয়ে যেত। কিন্তু তুমি এ আদেশ পালন করতে পারতে না। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যেসব বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে কোন নির্দেশ দিই না, সেগুলোকে সেভাবেই থাকতে দিও---ঘাঁটাঘাঁটি করে প্রশ্ন করো না। তোমাদের পূর্বে কোন কোন উম্মত বেশী প্রশ্ন করেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আল্লাহ্ ও রসূল যেসব বিষয় ফরয করেন নি, তারা প্রশ্ন করে সেগুলোকে ফরয করিয়ে নিয়েছিল এবং পরে সেগুলোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়েছিল। আমি যে কাজের আদেশ দিই সাধ্যানুযায়ী তা পালন করা এবং যে কাজে নিষেধ করি, তা পরিত্যাগ করাই তোমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে আমি নীরব থাকি, সেগুলো নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবে না)।

মহানবী (সা)-র পর নবুয়ত ও ওহীর আগমনের সমাপ্তি ঃ এ আয়াতের একটি প্রাসঙ্গিক বাক্যে বলা হয়েছে ঃ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنَزَّلُ الْقُرْاٰنُ تُبْدَ لَكُمْ

অর্থাৎ কোরআন অবতরণকালে যদি তোমরা এরূপ প্রশ্ন কর, তবে ওহীর মাধ্যমে উত্তর এসে যাবে। এতে 'কোরআন অবতরণকাল' বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোরআন অবতরণ সমাপ্ত হলে নবুয়ত ও ওহীর আগমনও বন্ধ করে দেওয়া হবে।

নবুয়তের আগমন খতম হয়ে যাওয়া ও ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর এ ধরনের প্রশ্নের ফলে যদিও নতুন কোন বিধান আসবে না এবং যা ফরয নয়, তা ফরয হবে না কিংবা ওহীর মাধ্যমে কারও গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাবে না তথাপি অনাবশ্যক প্রশ্ন তৈরী করে করে সেগুলোর তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া কিংবা অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরও নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধই থাকবে। কেননা, এতে করে নিজের ও অপরের সময় নষ্ট করা হয়। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার একটি সৌন্দর্য এই যে, মুসলমান ব্যক্তি অনর্থক বিষয়াদি পরিত্যাগ করে। আজকাল অনেক মুসলমান অনর্থক বিষয়াদির তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। মূসা (আ)-র মায়ের নাম কি ছিল, নূহ (আ)-র নৌকার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ কি ছিল, ইত্যাকার প্রশ্নের কোন সম্পর্ক মানুষের কর্মের সাথে নেই। উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা গেল যে, এ জাতীয় প্রশ্ন করা নিন্দনীয়, বিশেষ করে যখন একথাও জানা যায় যে, এরূপ প্রশ্নকারীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় মাস'আলা সম্পর্কেই অজ্ঞ থাকে। অনর্থক কাজে ব্যাপৃত হওয়ার ফলে মানুষ জরুরী কাজ থেকে বঞ্চিত থাকে। অতীতে ফিকাহ্‌বিদ আলিমরা মাস'আলা-মাসায়েলের অনেক কাল্পনিক দিক বের করে এবং বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরী করে শরীয়তের বিধান বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এগুলো জরুরী ছিল। তাই এসব প্রশ্ন অনর্থক ও অনাবশ্যক ছিল না। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা এই যে, কোন দীনী কিংবা জাগতিক উপকার লক্ষ্য না হলে যে-কোন জ্ঞানানুশীলন, কর্ম অথবা কথায় ব্যাপৃত হওয়া উচিত নয়।

বহীরা, সায়েবা ইত্যাদির সংজ্ঞা ঃ 'বহীরা', 'সায়েবা', 'হামী'-প্রভৃতি সবই জহিলিয়াত যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীর-বিদদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। তবে আলোচ্য শব্দগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সম্ভবপর। আমরা সহীহ্ বোখারী থেকে সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করছি।

'বহীরা' এমন জন্তুকে বলা হয় যার দুধ প্রতিমার নামে উৎসর্গ করা হত এবং কেউ নিজের কাজে ব্যবহার করত না।

'সায়েবা' ঐ জন্তু, যাকে প্রতিমার নামে আমাদের দেশের ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেওয়া হত।

'হামী' পুরুষ উট, যে বিশেষ সংখ্যক রমণ সমাপ্ত করে। এরূপ উটকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত।

'ওছীলা' যে উট উপর্যুপরি মাদী বাচ্চা প্রসব করে। জাহিলিয়াত যুগে এরূপ উষ্ট্রীকেও প্রতিমার নামে ছেড়ে দেওয়া হত।

এসব শিরকের নিদর্শনাবলী তো ছিলই ; তদুপরি যে জন্তুর গোশ্ত, দুধ ইত্যাদি দ্বারা উপকৃত হওয়া আল্লাহ্‌র আইনে বৈধ, নিজেদের পক্ষ থেকে শর্তাদি আরোপ করে সে জন্তুকে হালাল ও হারাম করার অধিকার তারা কোথায় পেল ? মনে হয় তারা শরীয়ত প্রণেতার পদে নিজেরাই আসীন হয়ে গিয়েছিল। আরও অবিচার এই যে, নিজেদের এসব মুশরিকসুলভ কুপ্রথাকে তারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্যের উপায় বলে মনে করত। এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনও এসব প্রথা নির্ধারণ করেন নি বরং তাদের বড়রা আল্লাহ্‌র প্রতি এ অপবাদ আরোপ করেছে এবং অধিকাংশ নির্বোধ জনগণ একে গ্রহণ করে নিয়েছে। মোট কথা, এখানে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অনর্থক প্রশ্ন করে শরীয়তের বিধানে সংকীর্ণতা ও কঠোরতা সৃষ্টি করা যেমন অপরাধ, তেমনি শরীয়ত প্রণেতার নির্দেশ ছাড়া স্বীয় অভিমত ও প্রবৃত্তি দ্বারা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আরও বড় অপরাধ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا
يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ
إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

(১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তাল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে, আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট, যার উপর আমরা আমাদের বাপদাদাকে পেয়েছি। যদি তাদের বাপদাদারা কোন জ্ঞান না রাখে এবং হেদায়েত প্রাপ্ত না হয়, তবুও কি তারা তাই করবে? (১০৫) হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। তোমরা যখন সৎপথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে।

যোগসূত্র ঃ উপরে কুপ্রথায় বিশ্বাসী কাফিরদের একটি মূর্খতা বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে এ ধরনের অনেক মূর্খতা বিদ্যমান ছিল, যা শুনে মুসলমানরা দুঃখ ও বেদনা অনুভব করত। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বলা হচ্ছে যে, তোমরা কেন দুঃখিত হও ? তোমাদের প্রতি নির্দেশ এই যে, তোমরা নিজের সংশোধন এবং সাধ্যমত অপরের সংশোধনে যত্নবান হও। প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারটি তোমাদের ইখতিয়ার বহির্ভূত। তাই নিজের কাজ কর---অপরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থেকো না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বিধান নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রসূল (সা)-এর দিকে (যার প্রতি সেসব বিধান অবতীর্ণ হয়েছে) এস। (যে বিষয়ের আলোকে সত্য প্রমাণিত হয়, তাকে সত্য মনে কর এবং যা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তাকে মিথ্যা মনে কর,) তখন তারা বলে ঃ (আমাদের এসব বিধান ও রসূলের প্রয়োজন নেই;) আমাদের জন্য ঐ (রীতিনীতিই) যথেষ্ট, যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি। (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তাদের জন্য সে রীতিনীতি সর্বাবস্থায়ই কি যথেষ্ট হবে?) যদি তাদের পিতৃপুরুষরা (ধর্মের) কোন জ্ঞান না রাখে এবং (কোন ঐশী গ্রন্থের) হেদায়েত না রাখে (তবুও কি)? হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজের (সংশোধনের) চিন্তা কর। (এ কাজটিই তোমাদের আসল কর্তব্য। অপরের সংশোধনের বিষয়টি হল এই যে, তোমরা যখন সাধ্যানুযায়ী এ সংশোধনের চেষ্টা করছ; কিন্তু ফলপ্রসূ হচ্ছে না, তখন তোমরা ফলপ্রসূ না হওয়ার চিন্তায় ব্যাপৃত হয়ো না। কেননা) তোমরা যখন (দীনের) পথে চলছ (এবং দীনের জরুরী কর্তব্য পালন করে যাচ্ছ অর্থাৎ নিজের সংশোধন করছ এবং অপরের সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছ) তখন যে ব্যক্তি (তোমাদের সংশোধন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও) পথভ্রষ্ট থাকে, তার (পথভ্রষ্ট থাকার) কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। (সংশোধন ইত্যাদি কাজে সীমাতিরিক্ত চিন্তিত হতে যেমন নিষেধ করা হয়েছে, তদ্রূপ নিরাশ হয়ে ক্রোধবশত ইহকালেই তাদের প্রতি শাস্তি অবতরণ কামনা করাও নিষিদ্ধ।) কেননা, সত্য ও মিথ্যার চূড়ান্ত মীমাংসা পরকালেই হবে। (সেমতে) আল্লাহ্র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তন হবে। অতঃপর তিনি তোমরা যা করতে, তা তোমাদের সবাইকে বলে দেবেন (এবং বলে দিয়ে সত্যের বিনিময়ে সওয়াব এবং মিথ্যার বিনিময়ে আযাবের আদেশ কার্যকর করবেন)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শানে নযুল ঃ জাহিলিয়াত যুগে যেসব কুপ্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছিল অন্যতম। এ কুপ্রথাই তাদেরকে কুকর্মে লিপ্ত ও সৎকর্ম থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। তফসীর দুররে মনসূরে ইবনে আবী হাতেমের বরাত দিয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি যদি সত্যোপলব্ধির ফলে মুসলমান হয়ে যেত, তবে তাকে এমনভাবে ধিক্কার দেওয়া হত যে, তুই আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে বেওকুফ সাব্যস্ত করেছিস্। তাদের রীতিনীতি ত্যাগ করে অন্য তরীকা অবলম্বন করেছিস্। তাদের এ অন্ধ বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় ঃ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۝

অর্থাৎ যখন তাদেরকে বলা হত যে, তোমরা আল্লাহ্র অবতীর্ণ সত্য বিধানাবলী ও রসূলের দিকে এস, যা সর্বদিক দিয়ে উপযোগী এবং তোমাদের মঙ্গল ও সাফল্যের রক্ষাকবচ,

তখন তারা এছাড়া কোন উত্তর দিত না যে, আমরা বাপদাদাদেরকে যে তরীকায় পেয়েছি, আমাদের জন্য তা-ই যথেষ্ট।

এ শয়তানী যুক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষকে সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করেছে। কোরআন পাক এর উত্তরে বলে ঃ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারে যে, কোরআন পাকের এ বাক্যটি কোন ব্যক্তি অথবা দলের অনুসরণ করার ব্যাপারে একটি বিশুদ্ধ মূলনীতি ব্যক্ত করেছে। ফলে অন্ধরা দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে এবং মূর্খ ও গাফিলদের জন্য সত্য প্রকাশের পথ খুলে গেছে। মূলনীতিটি এই যে, অজ্ঞরা জ্ঞানবানদের, অনভিজ্ঞরা অভিজ্ঞদের এবং মূর্খরা জ্ঞানীদের অনুসরণ করবে---একথা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি ও হেদায়েতের মাপকাঠি পরিত্যাগ করে বাপদাদা কিংবা ভাই-বন্ধুদের অনুসরণকে নীতি হিসাবে গ্রহণ করা কিছুতেই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না। অনুসৃত ব্যক্তি নিজে কোথায় যাচ্ছে এবং অনুসারীদেরকেই বা কোথায় নিয়ে যাবে একথা না জেনে তার পদাঙ্ক অনুসরণে লেগে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনিভাবে কিছু সংখ্যক লোক বেশী মানুষের সমাগমকেই অনুসরণের মাপকাঠি মনে করে। যার কাছে মানুষের ভিড় দেখে তারা তারই অনুসরণে লেগে যায়। এটিও একটি অযৌক্তিক কাজ। কেননা, জগতে সব সময়ই বেওকুফ, নির্বোধ ও কুকর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। তাই মানুষের ভিড়ই সত্যাসত্য ও ভালমন্দ চিহ্নিত করার মাপকাঠি হতে পারে না।

অযোগ্য ব্যক্তির অনুসরণ করা ধ্বংস ডেকে আনার শামিল ঃ কোরআন পাকের এ বাক্যের সুস্পষ্ট শিক্ষা এই যে, বাপদাদা, ভাই-বেরাদর ইত্যাদি কেউ অনুসৃত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রতিটি মানুষের পক্ষে সর্বপ্রথম স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও জীবনযাত্রার গতিপথ নির্ধারণ করা জরুরী। এরপর তা অর্জনের জন্য দেখা দরকার যে, এমন ব্যক্তি কে, যার লক্ষ্য অর্জনের পথ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে এবং এ পথে নিজেও চলছেন। এমন ব্যক্তি পাওয়া গেলে তাঁর অনুসরণ অবশ্যই মনযিলে-মকসুদে পৌঁছাতে পারে। মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণের তাৎপর্যও তাই। তাঁরা দীন সম্পর্কে যেমন সম্যক অবগত, তেমনি নিজেরাও এ পথেই চলেন। তাই অজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের অনুসরণ করে ধর্মের লক্ষ্য অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশ পালন করতে পারে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেই বিপথগামী, যার মনযিলে-মকসুদ জানা নেই কিংবা জেনেশুনে বিপরীত দিকে ধাবমান, তার পেছনে চলা জ্ঞানী মাত্রের দৃষ্টিতেই নিজ প্রচেষ্টা ও কর্মকে বিনষ্ট করার শামিল, বরং ধ্বংস ডেকে আনার নামান্তর। দুঃখের বিষয়, বর্তমান জ্ঞান-গরিমা ও আধুনিকতার যুগেও শিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এ সত্যের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করছে। বর্তমান ধ্বংস ও বিপর্যয়ের প্রধান কারণই হচ্ছে অযোগ্য ও ভ্রান্ত নেতাদের অনুসরণ।

অনুসরণের মাপকাঠি ঃ কোরআন পাকের এ বাক্য দুটি বিষয়কে অনুসরণের যুক্তিযুক্ত

ও সুস্পষ্ট মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে ঃ একটি علم ও অপরটি اهتداء । এখানে علم-এর অর্থ মনযিলে-মকসূদ ও মনযিলে-মকসূদ পর্যন্ত পৌঁছার পথ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং اهتداء-এর অর্থ এ লক্ষ্যের পথে চলা অর্থাৎ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্ম।

সার কথা এই যে, অনুসরণ করার জন্য যে ব্যক্তিকে নির্বাচন করবে প্রথম দেখে নেবে যে, অভীষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যের পথ সম্পর্কে সে অবগত কি-না। এরপর দেখবে, সে নিজেও সে পথেই চলছে কি-না এবং তার কর্ম তার জ্ঞানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না।

মোট কথা, কাউকে অনুসৃতব্য সাব্যস্ত করার জন্য তাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও সরল কর্মের কষ্টিপাথরে যাচাই করা জরুরী। শুধু বাপদাদা হওয়া কিংবা অনেক মানুষের নেতা হওয়া অথবা ধনাঢ্য হওয়া কিংবা রাষ্ট্রের অধিপতি হওয়া ইত্যাদি কোনটিই অনুসরণের মাপকাঠি হওয়ার যোগ্য নয়।

কারও সমালোচনা করার কার্যকরী পন্থা ঃ কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে বাপদাদার অনুসরণে অভ্যস্ত লোকদের বিভ্রান্তি ব্যক্ত করার সাথে সাথে অন্যের সমালোচনা ও তার বিভ্রান্তি প্রকাশ করার একটি কার্যকরী পন্থাও শিক্ষা দিয়েছে। এ পন্থায় সমালোচনা করলে সমালোচিত ব্যক্তি ব্যথিত কিংবা উত্তেজিত হয় না। কেননা, পৈতৃক ধর্ম অনুসরণ-কারীদের জওয়াবে কোরআন পাক একথা বলেনি যে, তোমাদের বাপদাদা মূর্খ ও পথভ্রষ্ট। বরং বিষয়টিকে প্রশ্নের আকারে বলেছেঃ বাপদাদার অনুসরণ তখনও কি যুক্তিযুক্ত হতে পারে, যখন বাপদাদার মধ্যে না থাকে জ্ঞান এবং না থাকে সৎকর্ম?

যারা মানুষের সংশোধন চিন্তা করে তাদের জন্য একটি সান্ত্বনা ঃ দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের সংশোধন চিন্তায় সবকিছু বিসর্জনকারী মুসলমানদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে ঃ সত্যপ্রচার ও শিক্ষায় তোমাদের সাধ্যমত চেষ্টা এবং যথাযথ হিতাকাঙ্ক্ষার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্টতায়ই ডুবে থাকে, তবে এর জন্য মোটেই চিন্তিত হয়ো না। এমতাবস্থায় অন্যের পথভ্রষ্টতার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ

অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা নিজের চিন্তা কর। তোমরা যখন সঠিক পথে চলছ, তখন যে বিপথগামী, তার কারণে তোমাদের কোনই ক্ষতি নেই।

এ আয়াতের বাহ্যিক শব্দের দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজের কর্ম সংশোধনের চিন্তা করাই যথেষ্ট ; অন্যরা যা ইচ্ছা করুক, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। অথচ এ বিষয়টি কোরআন পাকের বহু আয়াতের পরিপন্থী। সেসব আয়াতে 'সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বারণ' করাকে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হলে কিছু লোকের মনে প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে প্রশ্ন রাখেন এবং তিনি উত্তরে বলেন যে, আয়াতটি 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর পরিপন্থী নয়। তোমরা যদি 'সৎকাজে আদেশ দান' পরিত্যাগ কর, তবে অপরাধীদের সাথে তোমাদেরকেও

পাকড়াও করা হবে। এজন্যই তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে---তোমরা স্বীয় কর্তব্য পালন করতে থাক। জিহাদ এবং 'সৎকাজে আদেশ দান'-ও এ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো করার পরও যদি কেউ পথভ্রষ্ট থেকে যায়, তবে তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কোরআনের إِذَا اهْتَدَيْتُمْ শব্দে চিন্তা করলে এ তফসীরের যথার্থতা ফুটে ওঠে। কেননা, এর অর্থ এই যে, যখন তোমরা সঠিক পথে চলতে থাকবে, তখন অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর নয়। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি 'সৎকাজে আদেশ দানে'র কর্তব্যটি বর্জন করে, সে সঠিক পথে চলমান নয়।

তফসীর দুররে-মনসূরে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। তাঁকে কোন এক ব্যক্তি বলল যে, অমুক অমুক ব্যক্তির মধ্যে ঘোর বিবাদ-বিসম্বাদ রয়েছে। তারা একে অপরকে মুশরিক বলে অভিহিত করে। হযরত ইবনে উমর (রা) বললেন ঃ তুমি কি মনে কর যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে তোমাকে আদেশ করব? কখনই নয়। যাও তাদেরকে নম্রতার সাথে বোঝাও। যদি মানে, উত্তম ; নতুবা তাদের চিন্তা ছেড়ে নিজের চিন্তা কর। অতঃপর এ উক্তির প্রমাণ হিসাবে তিনি আলোচ্য আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।

পাপ দমন সম্পর্কে হযরত আবূ বকর (রা)-এর একটি ভাষণ ঃ আয়াতের বাহ্যিক শব্দাবলী থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) এক ভাষণে বললেন ঃ তোমরা আয়াতটি পাঠ করে একে অস্থানে প্রয়োগ করছ এবং বলছ যে, 'সৎকাজে আদেশ দান'-এর প্রয়োজন নেই। জেনে রাখ, আমি নিজে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে শুনেছি ঃ যারা কোন পাপকাজ হতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) তা দমন করতে চেষ্টা করে না, আল্লাহ্ তা'আলা সত্বরই হয়তো তাদেরকেও অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত করে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

এ হাদীসটি তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বর্ণিত রয়েছে। আবূ দাউদের ভাষায় হাদীসটি এরূপ ঃ যারা কোন অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখেও (সাধ্যানুযায়ী) বাধা দেয় না, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে একযোগে আযাবে নিক্ষেপ করবেন।

معروف ও منكر-এর অর্থ ঃ পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একথা জানা গেল যে, منكر অর্থাৎ অবৈধ কার্যাবলী দমন করা কিংবা কমপক্ষে ঘৃণা প্রকাশ করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। এখন জানা দরকার যে, معروف ও منكر কাকে বলে? معروف শব্দটি معرفة এবং منكر শব্দটি انكار থেকে উদ্ভূত। معروف বলা হয় কোন বস্তুকে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে বোঝা ও চেনা। এর বিপরীতে انكار বলে, না বোঝা ও না চেনা দুটি শব্দই বিপরীতমুখী। কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا— অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও

সামর্থ্যের বিকাশ দেখে তাঁর নিয়ামতসমূহকে চেনে, এরপর একগুঁয়েমিবশত সেগুলোকে এমনভাবে অস্বীকার করে, যেন এগুলোকে চেনেই না। এতে বোঝা গেল যে, আভিধানিক দিক দিয়ে معروف-এর অর্থ পরিচিত বস্তু এবং منكر-এর অর্থ অপরিচিত বস্তু। এ অর্থের সাথে সংগতি রেখে ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআন' গ্রন্থে শরীয়তের পরিভাষায় معروف ও منكر-এর অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ معروف ঐ কর্মকে বলা হয় যার উত্তম হওয়া যুক্তি কিংবা শরীয়তের মাধ্যমে জানা যায়। আর منكر এমন কাজকে বলা হয় যা যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিতে অপরিচিত অর্থাৎ মন্দ মনে করা হয়। তাই امر بالمعروف অর্থ হচ্ছে সৎ কাজে আদেশ দান এবং نهى عن المنكر অর্থ অসৎ কাজে নিষেধ করা।

মুজতাহিদ ইমামদের বিভিন্ন উক্তিতে কোন শরীয়তগত منكر নেই ঃ

কিন্তু এতে গোনাহ্ বা সওয়াব কিংবা মান্যকরণ ও অমান্যকরণ না বলে معروف ও منكر শব্দ ব্যবহার করার মধ্যে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করাই উদ্দেশ্য যে, যেসব সূক্ষ্ম ও ইজতিহাদী মাস'আলায় কোরআন ও সুন্নাহর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কিংবা অস্পষ্টতার কারণে ফিকহ্‌বিদরা বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন, সেগুলো এর আওতাভুক্ত নয়। মুজতাহিদ ইমাম-দের ইজতিহাদ আলিম সমাজে স্বীকৃত। তারা যদি কোন মাস'আলায় ভিন্নমুখী দুটি মত ব্যক্ত করেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোনটিকেই শরীয়তগত منكر বলা যায় না। বরং উভয় মতই معروف-এর অন্তর্ভুক্ত। এরূপ মাস'আলায় যে ব্যক্তি একটি মতকে প্রবল মনে করে, অপরটিকে গোনাহ্ হিসাবে অগ্রাহ্য করার অধিকারও তার নেই। এ কারণেই সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে অনেক ইজতিহাদী মতবিরোধ ও পরস্পর বিরোধী মতামত থাকা সত্ত্বেও কোথাও একথা বর্ণিত নেই যে, তাঁরা একে অপরকে ফাসিক কিংবা গোনাহ্‌গার বলেছেন। বাহাস-বিতর্ক, কথা কাটাকাটি ইত্যাদি সবই হতো এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করতেন, কিন্তু এ মতবিরোধের কারণে একজন অপরজনকে গোনাহ্‌গার মনে করতেন না।

সারকথা এই যে, ইজতিহাদী মতবিরোধের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি যে মতকে প্রবল মনে করেন তাই গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু ভিন্নমতকে منكر মনে করে অগ্রাহ্য করার অধিকার কারও নেই। এতে বোঝা গেল, আজকাল ইজতিহাদী মাস'আলা সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে যেসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করা হয়, সেগুলো 'সৎ কাজে আদেশ দান' ও 'অসৎ কাজে নিষেধকরণের' অন্তর্ভুক্ত নয়, নিছক অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই এসব মাসআলাকে রণক্ষেত্রে পরিণত করা হয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ

الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ۭ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِيْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا
نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّآ اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ۝ فَاِنْ عُثِرَ عَلٰٓى اَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ
اِثْمًا فَاٰخَرٰنِ يَقُوْمٰنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيٰنِ
فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَآ اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۚ اِنَّآ
اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِالشَّهَادَةِ عَلٰي وَجْهِهَآ اَوْ
يَخَافُوْٓا اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌۢ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوْا ۭ وَاللّٰهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

(১০৬) হে মু'মিনগণ! তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ণ দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে নামাযের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহ্‌র সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্‌গার হব। (১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, উভয় ওসী কোন গোনাহে জড়িত রয়েছে, তবে যাদের বিরুদ্ধে গোনাহ্ হয়েছিল, তাদের মধ্য থেকে মৃত ব্যক্তির নিকটতম দু'ব্যক্তি তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। অতঃপর আল্লাহ্‌র নামে কসম খাবে যে, অবশ্যই আমাদের সাক্ষ্য তাদের সাক্ষ্যের চাইতে অধিক সত্য এবং আমরা সীমা অতিক্রম করিনি। এমতাবস্থায় আমরা অবশ্যই অত্যাচারী হব। (১০৮) এটি এ বিষয়ের নিকটতম উপায় যে, তারা ঘটনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবে অথবা আশংকা করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর আবার কসম চাওয়া হবে। আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং শোন, আল্লাহ্ দুরাচারীদেরকে পথ-প্রদর্শন করবেন না।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে ধর্মীয় কল্যাণ সম্পর্কিত বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। এখন জাগতিক কল্যাণ সম্পর্কে কিছু বিধান উল্লেখ করা হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্

তা'আলা স্বীয় কৃপায় পরকাল সংশোধনের মতই বান্দার ইহকালেরও সংশোধন করেন। (বয়ানুল কোরআন)

শানে নযুল ঃ উল্লিখিত আয়াতসমূহ অবতরণের ঘটনা এই যে, বুদাইল নামক জনৈক মুসলমান তামীম ও আদী নামক দু'জন খৃস্টানের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করে। সিরিয়া পৌঁছেই বুদাইল অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে স্বীয় অর্থসম্পদের একটি তালিকা লিখে আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দেয় এবং বিষয়টি সঙ্গীদ্বয়ের কাছে গোপন রাখে। অসুস্থতা বৃদ্ধি পেলে সে খৃস্টান সঙ্গীদ্বয়কে ওসিয়ত করে যে, আমার মৃত্যু হলে আমার যাবতীয় আসবাবপত্র ওয়ারিসদের কাছে পৌঁছে দেবে। সেমতে বুদাইলের মৃত্যুর পর তার আসবাবপত্র এনে ওয়ারিসদের কাছে সমর্পণ করে, কিন্তু স্বর্ণের কারুকার্য খচিত একটি রূপার পেয়ালা তার আসবাবপত্র থেকে তুলে নেয়। ওয়ারিসরা আসবাবপত্রের মধ্যে তালিকা পেয়ে পেয়ালার কথা জানতে পারে। তারা খৃস্টানদ্বয়কে জিজ্ঞেস করল যে, মৃত ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ার পর কোন আসবাবপত্র বিক্রি করেছিল কি না? কিংবা অসুস্থতার কারণে চিকিৎসা ইত্যাদিতে কিছু সম্পদ ব্যয় হয়েছে কি না? তারা উভয়ই এ প্রশ্নের নাবোধক উত্তর দেয়। অবশেষে বিষয়টি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আদালতে উপস্থিত হয়। ওয়ারিসদের কোন সাক্ষী ছিল না। তাই খৃস্টান-দ্বয়কে আদেশ করা হল ঃ তোমরা কসম খেয়ে বল যে, তোমরা মৃত ব্যক্তির আসবাবপত্রের মধ্য থেকে কোন কিছু আত্মসাৎ করনি এবং কোন বস্তু গোপন করনি। অবশেষে তাদের কসম অনুযায়ী মোকদ্দমার রায় তাদের পক্ষে দেওয়া হয়। কিছুদিন পর প্রকাশ পেল যে, তারা উপরোক্ত পেয়ালাটি মক্কার জনৈক স্বর্ণকারের কাছে বিক্রি করেছে। জিজ্ঞেস করার পর তারা উত্তর দিল যে, আমরা পেয়ালাটি মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে ক্রয় করেছিলাম; কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কোন সাক্ষী না থাকায় আমরা ইতিপূর্বে মিথ্যারোপের ভয়ে তা উল্লেখ করিনি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পরস্পরের মধ্যে (অর্থাৎ পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে উদা-হরণত ওয়ারিসদেরকে মাল সোপর্দ করার জন্য) দু'ব্যক্তি ওসী হওয়া সমীচীন, (অবশ্য একজনের সামনে করাও জায়েয) যখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হয় (অর্থাৎ যখন ওসিয়ত করার সময় হয়)। (তবে) ঐ দু'ব্যক্তিকে ধর্মপরায়ণ হতে হবে এবং তোমা-দের মধ্য থেকে (অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্য থেকে) হতে হবে কিংবা বিজাতীয় দু'ব্যক্তি হবে যদি (মুসলমান পাওয়া না যায়। উদাহরণত) তোমরা সফরে যাও অতঃপর তোমাদের মৃত্যুর বিপদ আপতিত হয়। (এসব বিষয় ওয়াজিব নয়, তবে সমীচীন ও উত্তম। নতুবা কাউকে ওসী না করাও যেমন জায়েয, তেমনি একজন ওসী হওয়া কিংবা ধর্মপরায়ণ না হওয়া অথবা স্বগৃহে অবস্থানকালে অ-মুসলিমকে ওসী করা সবই জায়েয। অতঃপর ওসীদের বিধান এই যে,) যদি (কোন কারণে তাদের প্রতি) তোমাদের (অর্থাৎ ওয়ারিসদের) সন্দেহ হয়, তবে (হে বিচারপতিগণ, মামলা এভাবে মীমাংসা কর যে, প্রথমে বাদী ওয়ারিসদের এ বিষয়ে সাক্ষী তলব করবে যে, তারা অমুক বস্তু উদাহরণত পেয়ালা নিয়ে গেছে। যদি তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে বিবাদী ওসীদের কাছ থেকে এভাবে কসম নেবে যে,) উভয় (ওসী)-কে নামাযের (উদাহরণত আসরের) পর (উপস্থিত) থাকতে বলবে।

(কেননা, সাধারণত এ সময় জনসমাগম বেশী থাকে, তাই মিথ্যা কসম খেতে কিছু না কিছু লজ্জাবোধ করবে। এছাড়া সময়টিও মহিমামণ্ডিত, এদিকেও কিছু খেয়াল থাকবে। এর উদ্দেশ্য জনসমাবেশের স্থান ও বরকতের সময় দ্বারা কসমকে কঠোরতর করা।) অতঃপর উভয়ই (এভাবে) আল্লাহ্‌র কসম খাবে যে, (শপথবাক্য সহকারে এরূপ বলবে---) আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন (জাগতিক) উপকার গ্রহণ করতে চাই না (যে, জাগতিক উপকার লাভের জন্য কসমে সত্য বলা পরিহার করব)। যদিও (এ ঘটনায় আমাদের) কোন আত্মীয়ও হয় (যার উপকারকে আমরা নিজের উপকার ভেবে মিথ্যা কসম খেতাম ; এখন তো এরূপও কেউ নেই---যখন নিষিদ্ধ উপকারের কারণেও আমরা মিথ্যা বলতাম না, তখন এর উপকারের কারণে আমরা কেন মিথ্যা বলব ?) এবং আল্লাহ্‌র (পক্ষ থেকে যে) কথা (বলার নির্দেশ আছে, তা) আমরা গোপন করব না, (নতুবা যদি) আমরা (এরূপ করি) এমতাবস্থায় কঠোর গোনাহ্‌গার হব। (এটি উক্তিগত কঠোরতা---এর উদ্দেশ্য সত্যবাদিতা জরুরী হওয়া, মিথ্যা হারাম হওয়া এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের ধারণাকে চিন্তায় জাগ্রত করা, যা মিথ্যা শপথে বাধা দান করে। বর্ণিত কঠোরতার পর যদি বিচারক উপযুক্ত মনে করেন, তবে কঠোরতা ছাড়াই আসল বিষয়বস্তুর কসম খাবে। উদাহরণত মৃত ব্যক্তি আমাদেরকে পেয়ালা দেয়নি। অতঃপর এ কসম অনুযায়ী মামলার রায় ঘোষণা করা উচিত। আলোচ্য ঘটনায় তাই করা হয়েছিল।) অতঃপর যদি (কোন প্রকারে বাহ্যত) পরিব্যক্ত হয় যে, তারা উভয় ওসীও কোন গোনাহে্‌ জড়িত হয়েছে (যেমন, আয়াতের ঘটনায় পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মক্কায় পেয়ালাটি পাওয়া যায় এবং জিজ্ঞেস করার পর উভয় ওসী মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তা ক্রয় করার দাবী করে। এতে করে মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়ালাটি নেওয়ার স্বীকারোক্তি হয়ে যায় এবং এটি তাদের পূর্বেকার উক্তির বিপরীত, যাতে নেওয়ার কথাই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছিল। যেহেতু ক্ষতিকর বিষয় স্বীকার করা একটি প্রমাণ, তাই বাহ্যত তাদের আত্মসাৎকারী ও মিথ্যাবাদী হওয়া বোঝা গেল।) তবে এমতাবস্থায় মোকদ্দমার মোড় ঘুরে যাবে। যে ওসী পূর্বে বিবাদী ছিল, এখন ক্রয় করার দাবীদার হয়ে যাবে। এবং যে ওয়ারিসরা পূর্বে আত্মসাতের দাবীদার ছিল, এখন বিবাদী হয়ে যাবে কাজেই এখন মীমাংসার পথ হবে এই যে, প্রথমে ওসীদের কাছ থেকে ক্রয় করার সাক্ষী তলব করা হবে। যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করতে পারবে না, তখন তাদের (ওয়ারিসদের) মধ্য থেকে, যাদের বিরুদ্ধে (ওসীদের পক্ষ থেকে উল্লিখিত) গোনাহ্‌ হয়েছিল (এবং যারা শরীয়তসম্মতভাবে উত্তরাধিকারের যোগ্য, উদাহরণত আয়াতের ঘটনায়) দু'ব্যক্তি (ছিল) যারা সবার (অর্থাৎ ওয়ারিসদের মধ্যে উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে) নিকটতম, যেস্থলে (শপথের জন্য) ওসীদ্বয় দণ্ডায়মান হয়েছিল, সেখানে (এখন) এ দু'ব্যক্তি (শপথের জন্য) দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর উভয়ে (এভাবে) কসম খাবে যে, (শপথবাক্য সহকারে বলবে যে,) অবশ্যই আমাদের এ সাক্ষ্য (সন্দেহ থেকে বাহ্যত ও প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়ার কারণে) তাদের উভয়ের (ওসীদের) সাক্ষ্যের চাইতেও অধিক সত্য। (কেননা,) যদিও আমরা সে সাক্ষ্যের স্বরূপ অবগত নই, তথাপি বাহ্যত তা সন্দেহযুক্ত হয়ে গেছে এবং আমরা (সত্যের) সামান্যও সীমাতিক্রম করিনি। (নতুবা) আমরা (যদি এরূপ করি, তবে) এমতাবস্থায় কঠোর অত্যাচারী হব। (কেননা, পরের মাল জেনেশুনে নিয়ে যাওয়া অত্যাচার। এটিও একটি

কঠোরতা এবং বিচারকের মতের উপর নির্ভরশীল। অতঃপর আসল বিষয়বস্তুর জন্য কসম নেওয়া হবে। যেহেতু এটি অপরের কাজের জন্য কসম, তাই এর বাক্য এরূপ হবে 'আল্লাহ্‌র কসম আমাদের জানা মতে মৃত ব্যক্তি বাদীদের হাতে পেয়ালা বিক্রি করেনি। যেহেতু জানার বাস্তবতা ও অবাস্তবতার কোন বাহ্যিক উপায় হতে পারে না, তাই এর বাস্তবতার জন্য অধিক জোরদার কসম নেওয়া হবে। اَحَقُّ শব্দ থেকে এ কথা বোঝা যায়। এর সারমর্ম এই যে, এটি যেহেতু আমার উপরই নির্ভরশীল, তাই কসম খাচ্ছি। কেননা, এতে যেমন বাহ্যিক মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে না, তেমনি প্রকৃতপক্ষেও মিথ্যা নেই। এ ইঙ্গিতটি উপকারী। কেননা, এখানে জানার উপর শপথ। যেহেতু স্বীকারোক্তি ছাড়া এর মিথ্যা হওয়া প্রমাণিত হতে পারে না, তাই এতে যে আত্মসাৎ হবে, তা হবে ঘোরতর জুলুম। খুব সম্ভব এখানে ظَالِمِيْنَ শব্দটি এ কারণেই প্রয়োগ করা হয়েছে।) এটি (অর্থাৎ এ আইনটি, যা আয়াতদ্বয়ের সমষ্টিতে ব্যক্ত করা হল) খুব নিকটতম উপায় এ বিষয়ের যে, তারা (ওসীরা) ঘটনাকে ঠিকভাবে প্রকাশ করবে। (যদি অতিরিক্ত মাল সমর্পণ না হয়ে থাকে, তবে কসম খাবে, আর যদি হয়ে থাকে, তবে পাপকে ভয় করে অস্বীকার করবে। এটি হচ্ছে ওসীদেরকে কসম দেওয়ার তাৎপর্য।) অথবা এ বিষয়ের আশংকা (করে কসম খেতে অস্বীকার) করবে যে, তাদের কাছ থেকে কসম নেওয়ার পর (ওয়ারিসদের কাছ থেকে) কসম চাওয়া হবে (তখন আমাদেরকে লজ্জিত হতে হবে। এটি হচ্ছে ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার রহস্য। সব কটি অবস্থাতেই হকদারকে হক পৌঁছানো হয়েছে, যা আইনসিদ্ধ ও কাম্য। কেননা ওসীদেরকে কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে এবং ওসীরা সত্য সত্যই মাল সমর্পণ করলে তাদের উপর থেকে অপবাদ দূর করার কোন উপায় ছিল না। এখন কসম খাওয়া আইনসিদ্ধ হওয়ার কারণে ওসীরা সত্যবাদী হলে কসম খেয়ে দোষমুক্ত হয়ে যাবে এবং মিথ্যাবাদী হলে সম্ভবত মিথ্যা কসমকে ভয় করে কসম খেতে অস্বীকার করবে, ফলে ওয়ারিসদের হক প্রমাণিত হয়ে যাবে। অপরদিকে ওয়ারিসদের কসম দেওয়া আইনসিদ্ধ না হলে এবং হক অস্বীকার করা শরীয়তসিদ্ধ হলে, হক প্রমাণিত করার কোন উপায় থাকত না। পক্ষান্তরে হক অস্বীকার করা শরীয়তসিদ্ধ না হলে ওসীদের হক প্রমাণিত করার কোন উপায় ছিল না। এখন ওয়ারিসদের হক হলে তাদের হক প্রমাণিত হতে পারে এবং তাদের হক না হলে কসম খেয়ে অস্বীকার করার ফলে ওসীদের হক প্রমাণিত হয়ে যাবে। অতএব দু'অবস্থা হচ্ছে ওসীদেরকে কসম দেওয়ার তাৎপর্যভুক্ত। আর يَأْتُوْا بِالشَّهَادَةِ বাক্য দ্বারা উভয় অবস্থাই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে দু'অবস্থা হচ্ছে ওয়ারিসদেরকে কসম দেওয়ার রহস্যের অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থাটি ওসীদেরকে কসম দেওয়ার প্রথম অবস্থার মধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রথম অবস্থাটি اَوْ يَخَافُوْا বাক্য দ্বারা বোঝা যায়। সুতরাং উভয় প্রকার কসম দেওয়ার

মধ্যে সবগুলো অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে।) আর আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় কর (এবং কাজ-কারবার ও হকের ব্যাপারে মিথ্যা বলো না) এবং (এদের বিধান) শোন---(অর্থাৎ মান্য কর) এবং (যদি বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে ফাসিক হয়ে যাবে।) আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের (কিয়ামতের দিন অনুগতদের মর্যাদার দিকে) পথপ্রদর্শন করবেন না। (বরং মুক্তি পেলেও তাদের মর্যাদা কম থাকবে। অতএব এমন ক্ষতি কেন স্বীকার করবে?)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মাস'আলা ঃ মরণোন্মুখ ব্যক্তি যার হাতে মাল সোপর্দ করে অন্য কাউকে দিতে বলে যায়, তাকে ওসী বলা হয়। ওসী একজন বা একাধিক ব্যক্তিও হতে পারে।

o সফরে হোক কিংবা স্বগৃহে অবস্থানকালে মুসলমান ও ধর্মপরায়ণ ওসী নিয়োগ করা উত্তম ; জরুরী নয়।

o মোকদ্দমায় যে পক্ষ অতিরিক্ত বিষয় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়, সে বাদী এবং অপর পক্ষ বিবাদী।

o প্রথম বাদীর কাছ থেকে সাক্ষী তলব করা হয়। যদি সে শরীয়তের বিধি মোতাবেক সাক্ষী উপস্থিত করতে না পারে, তবে তার পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সাক্ষী উপস্থিত করতে পারলে বিবাদীর কাছ থেকে কসম নেওয়া হয় এবং তার পক্ষে মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়। যদি বিবাদী কসম খেতে অস্বীকার করে, তবে বাদীর পক্ষেই মোকদ্দমার রায় দেওয়া হয়।

o আলোচ্য আয়াতে অনুরূপ কাল কিংবা স্থান দ্বারা কসমকে কঠোর করা বিচারকের অভিমতের উপর নির্ভরশীল---জরুরী নয়। এ আয়াত দ্বারাও জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় না। অন্যান্য আয়াত ও হাদীস থেকে জরুরী না হওয়া প্রমাণিত হয়।

o বিবাদী নিজের কোন কাজ সম্পর্কে কসম খেলে ভাষা এরূপ হয়---আমি এ কাজ সম্পর্কে জানি না।

o যদি উত্তরাধিকারের মোকদ্দমায় ওয়ারিস বিবাদী হয়, তবে শরীয়তের আইনানুযায়ী যারা উত্তরাধিকারী, তাদেরকেই কসম খেতে হবে---একজন হোক কিংবা একাধিক। যারা উত্তরাধিকারী নয়, তারা কসম খাবে না।---(বয়ানুল-কোরআন)

কাফিরের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য ঃ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ .....أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ এ আয়াতে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে দু'ব্যক্তিকে ওসী নিযুক্ত কর। তারা তোমাদের মধ্য থেকেই হবে এবং ধর্মপরায়ণ হবে। যদি স্বজাতীয় লোক না থাকে, তবে বিজাতি অর্থাৎ কাফিরদের মধ্য থেকে নিযুক্ত কর।

এ আয়াত থেকে ইমাম আবূ হানীফা (র) এ মাস'আলা উদ্ভাবন করেছেন যে, কাফিরদের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্য বৈধ। কেননা আয়াতে কাফিরদের সাক্ষ্য মুসলমানের

ব্যাপারে বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ থেকে তা সুস্পষ্ট।

অতএব, কাফিরের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্য আরও উত্তমরূপে বৈধ হবে। কিন্তু পরে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ....আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফিরের সাক্ষ্যের বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু কাফিরদের ব্যাপারে কাফিরদের সাক্ষ্যের বৈধতা পূর্বাবস্থায়ই বহাল রয়েছে।---(কুরতুবী, আহ্‌কামুল-কোরআন)

ইমাম সাহেবের মতের সমর্থন এ হাদীস দ্বারাও হয়। জনৈক ইহুদী ব্যভিচারে লিপ্ত হলে জনগণ তার মুখে চুনকালি দিয়ে মহানবী (সা)-র দরবারে উপস্থিত করে। তিনি তার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলল ঃ সে ব্যভিচার করেছে। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে অপরাধীকে প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।---(জাসসাস)

প্রাপক খাতককে কয়েদ করাতে পারে ঃ تَحْبِسُونَهُمَا---আয়াত থেকে একটি মূলনীতি জানা যায় যে, যার যিম্মায় অপরের কোন প্রাপ্য ওয়াজিব রয়েছে, তাকে পাওনাদার ব্যক্তি পাওনার দায়ে প্রয়োজনবোধে কয়েদ করাতে পারে।---(কুরতুবী)

مِنْ بَعْدِ الصَّلٰوةِ---এখানে صلوة বলে আসরের নামায বোঝানো হয়েছে। এ সময়টি নির্ধারণ করার কারণ এই যে, আহ্‌লে-কিতাবরা এ সময়ের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করত। এ সময়ে মিথ্যা বলা তাদের মতে নিষিদ্ধ ছিল। এতে বোঝা যায় যে, কোন বিশেষ সময় কিংবা স্থানের শর্ত যোগ করে কসমকে কঠোর করা জায়েয।---(কুরতুবী)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ ۖ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا ۖ إِنَّكَ
أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١٠٩﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي
عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ۘ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ تُكَلِّمُ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۖ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ
وَالْإِنجِيلَ ۖ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا
فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۖ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۖ وَإِذْ تُخْرِجُ

الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝

(১০৯) যেদিন আল্লাহ্ সব পয়গম্বরকে একত্র করবেন, অতঃপর বলবেন ঃ তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন ঃ আমরা অবগত নই ; আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (১১০) যখন আল্লাহ্ বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্য করেছি। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে কোলেও এবং পরিণত বয়সেও এবং যখন আমি তোমাকে গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান, তওরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, অতঃপর তুমি যাতে ফুঁ দিতে ; ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে বের করে দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী ইসরাঈলকে তোমার থেকে নিবৃত্ত রেখে-ছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলে, অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল ঃ এটা প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

যোগসূত্র ঃ পূর্বে বিভিন্ন বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে এসব বিধি-বিধান পালন করার জন্য উৎসাহ প্রদান এবং সাথে সাথে তার বিরুদ্ধাচরণের ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়বস্তুকে অধিকতর জোরদার করার জন্য আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে---যাতে মানুষ অধিকতর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ হয় এবং বিরুদ্ধাচরণে বিরত থাকে। কোরআন পাকের অধিকাংশ বর্ণনাভঙ্গি এরূপ। অতঃপর সূরার শেষভাগে আহ্লে-কিতাবদের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কয়েকটি আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য আহ্লে-কিতাবদেরকে হযরত ঈসা (আ) যে আল্লাহ্র বান্দা এ তথ্যের প্রমাণ ও তিনি যে উপাস্য নন, এ সম্পর্কে কিছু বিষয় শোনানো (যদিও এ কথোপকথন কিয়ামতে সংঘটিত হবে)।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ঐ দিনটিও কেমন ভীতিপ্রদ হবে) যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরকে (তাঁদের উম্মতসহ) একত্র করবেন। অতঃপর (উম্মতের মধ্যে যারা অবাধ্য শাসানির উদ্দেশে তাদেরকে শোনাবার জন্য পয়গম্বরদের) বলবেন ঃ তোমরা (এসব উম্মতের পক্ষ থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা আরয করবেন ঃ (বাহ্যিক উত্তর তো আমাদের জানাই আছে এবং তা বর্ণনাও করব, কিন্তু তাদের অন্তরে যা কিছু ছিল, তা) আমরা অবগত নই (আপনি তা জানেন। কেননা,) নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (অর্থাৎ একদিন এমন আসবে এবং মানুষের কাজকর্ম ও অবস্থার তদন্ত হবে। তাই বিরুদ্ধাচরণ ও গোনাহ্ থেকে

তোমাদের বেঁচে থাকা উচিত। সেদিনই ঈসা (আ)-র সাথে বিশেষ বাক্যালাপ হবে।) যখন আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা, আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর (যেন আনন্দ সজীব হয়) যা তোমার মাতার প্রতি (বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারে) হয়েছে। (উদাহরণত) যখন আমি তোমাকে 'রূহুল-কুদ্স' (অর্থাৎ জিবরাঈল) (আ)-এর দ্বারা সাহায্য ও শক্তি যুগিয়েছি (এবং) তুমি মানুষের সাথে (উভয় অবস্থাতে একইভাবে কথা বলতে মায়ের) কোলেও এবং পরিণত বয়সেও (এসব কথাবার্তার মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না।) এবং যখন আমি তোমাকে (ঐশী) গ্রন্থ, প্রগাঢ় জ্ঞান এবং (বিশেষ করে) তওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়েছি এবং যখন তুমি কাদামাটি দিয়ে পাখীর প্রতিকৃতির মত প্রতিকৃতি নির্মাণ করতে আমার আদেশে, তৎপর তুমি তাতে (নির্মিত প্রতিকৃতিতে) ফুঁ দিতে, ফলে তা আমার আদেশে (সত্যি সত্যি প্রাণবিশিষ্ট) পাখী হয়ে যেত এবং তুমি আমার আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করে দিতে এবং যখন তুমি আমার আদেশে মৃতদেরকে (কবর থেকে) বের করে (ও জীবিত করে) দাঁড় করিয়ে দিতে এবং যখন আমি বনী-ইসরাঈল (-এর মধ্য থেকে যারা তোমাদের বিরোধী ছিল, তাদের)-কে তোমা থেকে (অর্থাৎ তোমাকে হত্যা করা থেকে) নিবৃত্ত রেখেছিলাম যখন (তারা তোমার অনিষ্ট সাধন করতে চেয়েছিল---যখন) তুমি তাদের কাছে (স্বীয় নবুয়তের) প্রমাণাদি (মো'জেযাসমূহ) নিয়ে এসেছিলে। অতঃপর তাদের মধ্যে যারা কাফির ছিল, তারা বলল যে, এ (মো'জেযাগুলো) প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছুই নয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কিয়ামতে পয়গম্বরদের সর্বপ্রথম প্রশ্ন করা হবেঃ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ

—কিয়ামতে পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সব মানুষ একটি উন্মুক্ত মাঠে উপস্থিত হবে। যে-কোন অঞ্চলের, যে-কোন দেশের এবং যে-কোন সময়ের মানুষই হোক না কেন, সবাই সে সুবিশাল ময়দানে উপস্থিত হবে এবং সবার কাছ থেকে তাদের সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে। কিন্তু আয়াতে বিশেষভাবে নবী-রসূলদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যেঃ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ ---অর্থাৎ ঐ দিনটি বাস্তবিকই স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা সব পয়গম্বরকে হিসাবের জন্য একত্র করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, একত্রিত সবাইকে করা হবে, কিন্তু সর্বপ্রথম প্রশ্ন নবী-রসূলদেরই করা হবে, যাতে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ দেখতে পায় যে, আজ হিসাব ও প্রশ্ন থেকে কেউ বাদ পড়বে না। পয়গম্বরদের যে প্রশ্ন করা হবে, তা এইঃ مَاذَا أُجِبْتُمْ---অর্থাৎ তোমরা যখন নিজ নিজ উম্মতকে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর সত্য ধর্মের দিকে আহবান করেছিলে, তখন তারা তোমাদের কি উত্তর দিয়েছিল? তারা তোমাদের বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেছিল, না অস্বীকার ও বিরোধিতা করেছিল?

এ প্রশ্ন যদিও আম্বিয়া (আ)-কে করা হবে, কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে তাঁদের উম্মতকে শোনানো অর্থাৎ উম্মতরা যেসব সৎকর্ম ও কুকর্ম করেছে, তার সাক্ষ্য সর্বপ্রথম তাদের

পয়গম্বরদের কাছ থেকে নেওয়া হবে। উম্মতের জন্যও মুহূর্তটি হবে অত্যন্ত নাজুক। কারণ, তারা এ হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে যখন নিজেদের নবী-রসূলদের সুপারিশ আশা করবে, তখনই স্বয়ং নবী-রসূলদের কাছে তাদের সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হবে। এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, আম্বিয়ারা ভ্রান্ত ও বাস্তববিরোধী কথা বলতে পারবেন না। তাই গোনাহ্‌গার ও অপরাধীরা আশঙ্কা করবে যে, যখন স্বয়ং নবীরাই আমাদের অপরাধসমূহের সাক্ষ্যদাতা তখন আর কে আমাদের সুপারিশ ও সাহায্য করবে ?

এ প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বলবেন ঃ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ অর্থাৎ তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। আপনিই স্বয়ং যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

একটি সন্দেহের নিরসন ঃ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, প্রত্যেক পয়গম্বরের ওফাতের পর তাঁর যে উম্মত জন্মগ্রহণ করে, তাদের সম্পর্কে পয়গম্বরদের এ উত্তর নির্ভুল ও সুস্পষ্ট। কেননা, অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ ছাড়া কারও জানা নেই। কিন্তু বিরাট সংখ্যক উম্মত এমনও তো রয়েছেন, যাঁরা স্বয়ং পয়গম্বরদের অক্লান্ত চেষ্টায় তাঁদের হাতেই মুসলমান হন এবং তাঁদের সামনেই বর্ণিত নির্দেশাবলী পালন করেন। এমনিভাবে যেসব কাফির পয়গম্বরদের আদেশের বিরোধিতা ও তাঁদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের সম্পর্কে একথা বলা কিভাবে নির্ভুল হতে পারে যে, তাদের ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানা নেই! তফসীরে বাহরে-মুহীত-এ ইমাম আবূ আবদুল্লাহ্ রাযী এর উত্তরে বলেন ঃ এখানে পৃথক পৃথক দু'টি বিষয় রয়েছে ঃ (এক) ইলম্---যার অর্থ পূর্ণ বিশ্বাস ; (দুই) প্রবল ধারণা। একজন মানুষ অন্য একজন মানুষের সামনে থাকা সত্ত্বেও তার ঈমান ও কাজকর্ম সম্পর্কে প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই সাক্ষ্য দিতে পারে---পূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়। কেননা অন্তরে ভেদ ও সত্যিকার ঈমান সম্পর্কে কেউ ওহী ব্যতীত নিশ্চিতভাবে জানতে পারে না। কারণ ঈমানের সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। প্রত্যেক উম্মতের কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদেরও একটি দল ছিল। তারা বাহ্যত ঈমানও আনত এবং নির্দেশাবলীও পালন করত। কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না এবং নির্দেশাবলী অনুসরণের আন্তরিক কোন প্রেরণাও ছিল না। তাদের মধ্যে যা কিছু, সবই ছিল লোক-দেখানো। তবে বাহ্যিক ক্রিয়াকর্মের উপরই জাগতিক বিচার নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে, আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলী অনুসরণ করে এবং ইসলাম ও ঈমান-বিরোধী কোন কথা ও কর্মে জড়িত হয় না, নবী-রসূলরা তাকে ঈমানদার ও সৎকর্মী বলতে বাধ্য ছিলেন, সে অন্তরে খাঁটি ঈমানদার কিংবা মুনাফিক যাই হোক। এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ نحن نحكم بالظواهر والله متولى السرائر অর্থাৎ আমরা তো বাহ্যিক কাজকর্ম দেখে বিচার করি। অন্তর্নিহিত গোপন ভেদের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্ তা'আলা।

এ বিধান অনুযায়ী দুনিয়াতে আম্বিয়া (আ) ও তাঁদের উত্তরাধিকারী আলিম সমাজ বাহ্যিক কাজকর্মের ভিত্তিতে কারও ঈমানদার সৎকর্মী হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিতে পারতেন কিন্তু আজ সে দুনিয়া ও দুনিয়ার রীতিনীতি শেষ হয়ে গেছে। আজ হাশরের ময়দান। এখানে চুলচেরা তথ্য উদ্‌ঘাটিত হবে এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রথমে অন্যদের সাক্ষ্য নেওয়া হবে। যদি অপরাধী এতে নিশ্চিত না হয় এবং স্বীয় অপরাধ স্বীকার না করে, তবে বিশেষ ধরনের সরকারী সাক্ষী উপস্থিত করা হবে। অপরাধীদের মুখে ও জিহবায় সীল মেরে দেওয়া হবে এবং তাদের হস্ত, পদ ও চামড়ার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। এরা প্রত্যেক কাজের পূর্ণ স্বরূপ তুলে ধরবে—

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ -

অর্থাৎ অদ্য আমি তাদের মুখে সীল মেরে দেব। তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পদযুগল তাদের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তখন মানুষ জানতে পারবে যে, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ছিল রাব্বুল আলামীনের গুপ্ত পুলিশ। এদের বর্ণনার পর অস্বীকার করার কোন উপায়ই থাকবে না।

মোট কথা, পরজগতে শুধু ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে কোন কিছুর বিচার করা হবে না বরং অকাট্য জ্ঞান ও দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সবকিছুর বিচার হবে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, কারও ঈমান ও কর্মের সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও নেই। তাই হাশরের ময়দানে যখন নবী-রসূলদের প্রশ্ন করা হবে مَاذَا اُجِبْتُمْ তখন তাঁরা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলবেন যে, এ প্রশ্ন ইহজগতে হচ্ছে না যে, ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে জওবাব দিলেই চলবে, বরং এ প্রশ্ন হচ্ছে হাশরের ময়দানে, যেখানে দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কোন কিছু বলা হবে না। তাই তাঁদের এ উত্তর যথার্থ ও সঙ্গত যে, এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর পয়গম্বরদের চূড়ান্ত দয়ার্দ্রতার প্রকাশ ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, উম্মতের গ্রহণ করা ও গ্রহণ না করা এবং আনুগত্য ও অবাধ্যতার যেসব ঘটনা তাঁদের সামনে সংঘটিত হয়েছে, এগুলো সম্পর্কে প্রবল ধারণাপ্রসূত যে জ্ঞান তাঁরা অর্জন করেছিলেন, উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে অন্তত তা বর্ণনা করা উচিত ছিল। এ জ্ঞানটি নিশ্চিত কিনা, শুধু এ বিষয়টিরই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সমর্পণ করলে চলত। কিন্তু এখানে নবী-রসূলরা নিজস্ব জ্ঞান ও সংঘটিত ঘটনাবলী একেবারেই উল্লেখ করেন নি। সবকিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানের উপর সমর্পণ করে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।

এর তাৎপর্য এই যে, নবী-রসূলরা নিজ নিজ উম্মত ও সাধারণ সৃষ্টির প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল। তাঁদের সম্পর্কে এমন কোন কথাই উচ্চারণ করতে তাঁরা অনিচ্ছুক, যার ফলে

তারা বিপদের সম্মুখীন হয়। তবে নিরুপায় হলে অবশ্যই বলতে হত। এখানে অকাট্য জ্ঞান না থাকার অজুহাত ছিল। এ অজুহাতকে কাজে লাগিয়ে মুখে উম্মতের বিরুদ্ধে কিছু বলা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারতেন এবং সেমতে তাঁরা তাই করে আত্মরক্ষা করেছেন।

হাশরে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন ঃ সারকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যের একটি ঝলক মাত্র সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়েছে। হিসাব-কিতাবের কাঠ-গড়ায় আল্লাহ্ তা'আলার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় রসূলরা কম্পিত বদনে উপস্থিত হবেন। সুতরাং অন্যদের যে কি অবস্থা হবে, তা সহজেই অনুমেয়। তাই এখন থেকেই সে ভয়াবহ দিনের চিন্তা করা উচিত এবং জীবনকে এ হিসাব-কিতাবের প্রস্তুতিতে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

لاتزول قدما ابن ادم يوم القيامة حتى يسئل عن خمس عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه وعن ماله من اين اكتسبه واين انفقه وماذا عمل بما علم -

অর্থাৎ হাশরের ময়দানে কোন ব্যক্তির পদযুগল ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হয়। প্রথম এই যে, সে জীবনের সুদীর্ঘ ও প্রচুর সংখ্যক দিবারাত্রিকে কি কাজে ব্যয় করেছে? দ্বিতীয় এই যে, বিশেষ-ভাবে কর্মক্ষম যৌবনকালকে সে কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তৃতীয় এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন্ (হালাল কিংবা হারাম) পথে উপার্জন করেছে? চতুর্থ এই যে, অর্থকড়িকে সে কোন্ (জায়েয কিংবা নাজায়েয) কাজে ব্যয় করেছে? পঞ্চম এই যে, নিজ ইল্ম অনুযায়ী সে কি আমল করেছে?

আল্লাহ্ তা'আলা চূড়ান্ত অনুগ্রহ ও দয়াবশত এর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মাধ্যমে উম্মতের কাছে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এখন এসব প্রশ্নের সমাধান শিক্ষা করাই উম্মতের কাজ। পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করে দেওয়ার পরও যদি কেউ ফেল করে, তবে এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে?

হযরত ঈসা (আ)-র সাথে বিশেষ প্রশ্নোত্তর ঃ প্রথম আয়াতে সমস্ত পয়গম্বরের অবস্থা ও তাঁদের সাথে প্রশ্নোত্তর বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় আয়াতে এবং এর পরবর্তী নয় আয়াতে (সূরার শেষ পর্যন্ত) বিশেষভাবে বনী ইসরাঈলের শেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আ)-র সাথে আলোচনা ও তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহের কিছু বিবরণ দেওয়া হয়েছে। হাশরে তাঁকে একটি বিশেষ প্রশ্ন ও তার উত্তর পরবর্তী আয়াতসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।

এ প্রশ্নোত্তরের সারমর্মও বনী ইসরাঈল তথা সমগ্র মানবজাতির সামনে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরা। এ ময়দানে রূহুল্লাহ্ ও কালেমাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র আত্মা, আল্লাহ্র বাণী) অর্থাৎ ঈসা (আ)-কেও প্রশ্ন করা হবে যে, তোমার উম্মত তোমাকে আল্লাহ্র অংশী-দার সাব্যস্ত করেছে। হযরত ঈসা (আ) স্বীয় সম্মান, মাহাত্ম্য, নিষ্পাপতা ও নবুয়ত সত্ত্বেও

অস্থির হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে সাফাই পেশ করবেন। একবার নয়, বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে প্রকাশ করবেন যে, তিনি উম্মতকে এ শিক্ষা দেন নি। প্রথমে বলবেন ঃ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيْ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِيْ بِحَقٍّ ---অর্থাৎ আপনি পবিত্র, আমার কি সাধ্য ছিল যে, আমি এমন কথা বলব, যা বলার অধিকার আমার নেই?

স্বীয় সাফাইয়ের দ্বিতীয় ভঙ্গি এই যে, তিনি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাকে সাক্ষী করে বলবেন ঃ যদি আমি এরূপ বলতাম, তবে অবশ্যই আপনার তা জানা থাকত। কেননা, আপনি তো আমার অন্তরের গোপন রহস্য সম্পর্কেও অবগত। কথা ও কর্মেরই কেন, আপনি তো 'আল্লামুল-গুয়ুব,' যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

এ দীর্ঘ ভূমিকার পর হযরত ঈসা (আ) প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

হযরত ঈসা (আ)-র উত্তর ঃ অর্থাৎ আমি তাদেরকে ঐ শিক্ষাই দিয়েছি, যার নির্দেশ আপনি দিয়েছিলেন, أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ----অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দাসত্ব অবলম্বন কর, যিনি আমার ও তোমাদের সকলের পালনকর্তা। এ শিক্ষার পর আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্মের সাক্ষী ছিলাম, (তখন পর্যন্ত তাদের কেউ এরূপ কথা বলত না---) এরপর আপনি যখন আমাকে উঠিয়ে নেন, তখন তারা আপনার দেখাশোনার মধ্যে ছিল। আপনিই তাদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আ)-র প্রতি কতিপয় বিশেষ অনুগ্রহের বর্ণনা ঃ আলোচ্য আয়াত-সমূহে হযরত ঈসা (আ)-র সাথে যে প্রশ্নোত্তরের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার পূর্বে ঐসব অনুগ্রহের বিষয়ও উল্লেখিত হয়েছে, যা বিশেষভাবে হযরত ঈসা (আ)-কে মো'জেযার আকারে দেওয়া হয়। এতে একদিকে বিশেষ অনুগ্রহ ও অপরদিকে জবাবদিহির দৃশ্যের অবতারণা করে বনী ইসরাঈলের ঐ জাতিদ্বয়কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে, যাদের এক জাতি তাঁকে অপমানিত করে এবং নানা অপবাদ আরোপ করে কষ্ট দেয় এবং অন্য জাতি 'আল্লাহ্' কিংবা 'আল্লাহ্‌র পুত্র' আখ্যা দেয়। অনুগ্রহ উল্লেখ করে প্রথম জাতিকে এবং প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করে শেষোক্ত জাতিকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এখানে যেসব অনুগ্রহ কয়েকটি আয়াতে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে একটি বাক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য। এতে বলা হয়েছে ঃ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ---অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-কে দেয়া একটি বিশেষ মো'জেযা এই যে, তিনি মানুষের সাথে শিশু অবস্থায়ও কথা বলেন এবং পরিণত বয়সেও কথা বলেন।

এখানে প্রথমোক্ত বিষয়টি যে মো'জেযা ও বিশেষ অনুগ্রহ, তা বলাই বাহুল্য। জন্ম গ্রহণের প্রথম দিকে শিশু কথা বলতে পারে না। কোন শিশু মায়ের কোলে কিংবা দোলনায় কথাবার্তা বললে তা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে গণ্য হবে। পরিণত বয়সে কথা বলা, যা আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক মানুষই এ বয়সে কথা বলে থাকে। কিন্তু হযরত ঈসা (আ)-র বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, এটিও একটি মো'জেযা। কেননা, পরিণত বয়সে পৌঁছার পূর্বেই ঈসা (আ)-কে ইহজগত থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন এ জগতের মানুষের সাথে পরিণত বয়সে কথা বলা তখনই হতে পারে, যখন দ্বিতীয়বার তিনি এ জগতে পদার্পণ করবেন। মুসলমানদের সর্বসম্মত বিশ্বাস তা-ই এবং কোরআন ও সুন্নাহ্‌র বর্ণনা থেকেও একথাই প্রমাণিত। অতএব বোঝা গেল যে, হযরত ঈসা (আ)-র শিশু অবস্থায় কথা বলা যেমন মো'জেযা, তেমনি পরিণত বয়সে কথা বলাও একটি মো'জেযা বলেই গণ্য হবে। কারণ, তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে পদার্পণ করবেন।

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ۖ قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ
بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ
رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ
أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا
عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾
قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ
عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের মনে জাগ্রত করলাম যে, আমার প্রতি এবং আমার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তখন তারা বলতে লাগল, আমরা বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আনুগত্যশীল। (১১২) যখন হাওয়ারীরা বলল ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা ! আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করে দেবেন ? সে বলল ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। (১১৩) তারা বলল ঃ আমরা তা থেকে খেতে

চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে, আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। (১১৪) ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেন ঃ হে আল্লাহ্—আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতারণ করুন। তা আমাদের জন্য অর্থাৎ আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদেরকে রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (১১৫) আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতারণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর যখন আমি 'হাওয়ারীদের (ইঞ্জীলে আপনার বর্ণনার মাধ্যমে) নির্দেশ দিলাম যে, আমার প্রতি ও আমার রসূল ঈসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর; (তখন) তারা (প্রত্যুত্তরে আপনাকে) বলল ঃ আমরা (আল্লাহ্ ও রসূল অর্থাৎ আপনার প্রতি) বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং আপনি সাক্ষী থাকুন যে, আমরা আল্লাহ্র ও আপনার প্রতি পূর্ণ আনুগত্যশীল। সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন হাওয়ারীগণ [হযরত ঈসা (আ)-কে] বলল ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম। আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন (অর্থাৎ হিকমত বিরোধী হওয়া ইত্যাদি কোন বিষয় এর পরিপন্থী তো নয়) যে, আমাদের জন্য আকাশ থেকে কিছু (রান্না করা) খাদ্য অবতারণ করে দেবেন? তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। (উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা তো ঈমানদার, তাই আল্লাহ্কে ভয় কর এবং মো'জেযার ফরমায়েশ করা থেকে বিরত থাক। কারণ, এটি অনাবশ্যক হওয়ার কারণে শিষ্টাচার বিরোধী।) তারা বলল, (আমাদের উদ্দেশ্য অনাবশ্যক ফরমায়েশ করা নয়; বরং একটি উপযোগিতার কারণেই আবেদন করছি। তা এই যে,) আমরা (একে তো) এই চাই যে, (বরকত হাসিল করার জন্য) তা থেকে আহার করব এবং (দ্বিতীয়ত এই চাই যে,) আমাদের অন্তরসমূহ (ঈমানের ব্যাপারে) পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে আর (পরিতৃপ্ত হওয়ার অর্থ এই যে,) আমাদের এ বিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়ে যাবে যে, আপনি (রিসালতের দাবীর ব্যাপারে) আমাদের সাথে সত্য (কথাই) বলেছেন। (কেননা, প্রমাণ যতই বৃদ্ধি পায়, দাবীর প্রতি বিশ্বাসও ততই দৃঢ় হয়।) আর (তৃতীয়ত) আমরা এই চাই যে, (ঐ লোকদের সামনে, যারা এ মো'জেযা দেখেনি) সাক্ষ্য প্রদানকারী হয়ে যাব (যে আমরা এমন মো'জেযা দেখেছি---যাতে করে আপনি তাদের সামনে রিসালত প্রমাণ করতে পারেন এবং এ বিষয়টি যেন তাদের সুপথ প্রাপ্তির উপায় হয়ে যায়)। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) (যখন দেখলেন যে, এ আবেদনে তাদের উদ্দেশ্য সৎ, তখন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে) দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ্, আমাদের পালনকর্তা! আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্য অবতারণ করুন ---তা (অর্থাৎ সে খাদ্য) আমাদের সবার (অর্থাৎ) আমাদের মধ্যে যারা প্রথম (অর্থাৎ বর্তমান কালে আছে) এবং যারা পরবর্তী (কালে আগমন করবে তাদের) সবার জন্য আনন্দোৎসব হবে। (উপস্থিত লোকদের আনন্দ হবে আহার করার কারণে এবং আবেদন গৃহতী

হওয়ার কারণে। পরবর্তী লোকদের আনন্দ হবে পূর্ববর্তীদের প্রতি নিয়ামত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে, এ লক্ষ্যটি ঈমানদারদের বেলায়ই প্রযোজ্য।) এবং (এটা) আপনার পক্ষ থেকে (আমার রিসালত প্রমাণের জন্য) একটা নিদর্শন হবে (যার ফলে ঈমানদারদের ঈমান সুদৃঢ় হবে এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে একটা নিদর্শন হয়ে থাকবে। এ লক্ষ্যটি বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী সবার বেলায় প্রযোজ্য।) আর আপনি আমাদেরকে (সে খাদ্য) দান করুন এবং আপনিই দানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম (কেননা, সবাই নিজের স্বার্থে দান করে; কিন্তু আপনার দান সৃষ্ট জীবের স্বার্থে, তাই আমরা স্বীয় স্বার্থ তুলে ধরে আপনার কাছে খাদ্যের আবেদন করছি)। আল্লাহ্ তা'আলা (উত্তরে) বললেন ঃ (আপনি লোকদেরকে বলে দিন যে,) আমি সে খাদ্য (আকাশ থেকে) তোমাদের প্রতি অবতারণ করব। অতঃপর যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্য থেকে এরপর (এর প্রতি) অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে (অর্থাৎ যুক্তিসম্মতভাবে এর প্রতি যত সম্মান প্রদর্শন করা দরকার, তা করবে না) আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি (তখনকার) বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মো'জেযা দাবী করা মু'মিনের পক্ষে অনুচিত ঃ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ— যখন হাওয়ারীগণ ঈসা (আ)-র কাছে আকাশ থেকে খাদ্যাধার অবতারণ দাবী করল, তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে আল্লাহ্কে ভয় কর। এতে বোঝা যায় যে, ঈমানদার বান্দার পক্ষে এ ধরনের ফরমায়েশ করে আল্লাহ্কে পরীক্ষা করা কিংবা তাঁর কাছে অলৌকিক বিষয় দাবী করা একান্ত অনুচিত। বরং ঈমানদার বান্দার পক্ষে আল্লাহ্র নির্ধারিত পথেই রুযী ইত্যাদি অন্বেষণ করা কর্তব্য।

নিয়ামত অসাধারণ বড় হলে অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও বড় হয় ঃ فَاِنِّىْٓ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّآ اُعَذِّبُهٗٓ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ— এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, নিয়ামত অসাধারণ ও অনন্য হলে তার কৃতজ্ঞতার তাকীদও অসাধারণ হওয়া দরকার এবং অকৃতজ্ঞতার শাস্তিও অসাধারণ হওয়াই স্বাভাবিক।

মায়েদা তথা খাদ্যাধার আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল কিনা, এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন ঃ অবতীর্ণ হয়েছিল। তিরমিযীর হাদীসে আম্মার ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত আছে যে, খাদ্যাধার আকাশ থেকে নাযিল হয়েছিল এবং তাতে রুটি ও গোশত ছিল। এ হাদীসে আরও বলা হয়েছে যে, তারা

(অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক) বিশ্বাসভঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল এবং পরবর্তী দিনের জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিল। ফলে তারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

(نعوذ با لله من غضب الله)

এ হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, তারা তা ভক্ষণও করেছিল। আয়াতের نأ كل শব্দে এ তথ্যও বিবৃত হয়েছে। তবে পরবর্তী সময়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখা নিষিদ্ধ ছিল (বয়ানুল কোরআন)

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي
وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ
لِي ۚ بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ
مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا
أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا
دُمْتُ فِيهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

(১১৬) যখন আল্লাহ্ বললেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহ্কে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর ? ঈসা বলবেন ঃ আপনি পবিত্র ! আমার জন্য শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই তা পরিজ্ঞাত ; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না, যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত। (১১৭) আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর—যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (১১৮) যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আর (সে সময়টিও উল্লেখযোগ্য) যখন আল্লাহ্ তা'আলা [কিয়ামতে খৃস্টানদেরকে শোনাবার জন্য হযরত ঈসা (আ)-কে] বলবেন ঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম, [তাদের মধ্যে যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে ঈসা (আ) ও মরিয়ম (আ)-কে উপাস্যতায় অংশীদার মনে করত] তুমি কি তাদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আমাকে [অর্থাৎ ঈসা (আ)-কে] এবং আমার মাতা (মরিয়ম)-কেও আল্লাহ্ ব্যতীত উপাস্যরূপে গ্রহণ কর ? তখন ঈসা (আ) নিবেদন করবেন ঃ (তওবা, তওবা) আমি তো (স্বয়ং নিজ বিশ্বাসে) আপনাকে (অংশীদার থেকে) পবিত্র মনে করি। (যেমন আপনি বাস্তবেও পবিত্র। এমতাবস্থায়) আমার জন্য কিছুতেই শোভা পেত না যে, আমি এমন কথা বলতাম, যা বলার কোন অধিকারই আমার নেই (নিজ বিশ্বাসের দিক দিয়েও না, আমি একত্ববাদী অর্থাৎ এক আল্লাহ্তে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছানোর দিক দিয়েও না। কারণ, এরূপ কোন পয়গাম আমাকে দেওয়া হয়নি। আমার এ 'না' বলার প্রমাণ এই যে,) যদি আমি (বাস্তবে বলে থাকি) তবে আপনি অবশ্যই তা পরিজ্ঞাত রয়েছেন (কিন্তু আপনার জ্ঞানেও যখন আমি বলিনি, তখন বাস্তবেও বলিনি। বলে থাকলে আপনার তা পরিজ্ঞাত হওয়া এজন্য জরুরী যে) আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন (কাজেই মুখে যা বলতাম তা কিরূপে না জানতেন) এবং আমি (তো অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মতই এমন অক্ষম যে) আপনার জ্ঞানে যা আছে, তা (আপনার বলে দেওয়া ছাড়া) জানি না (যেমন, অন্যান্য সৃষ্ট জীবের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং) আপনিই সব অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী। (অতএব নিজের এতটুকু অক্ষমতা এবং আপনার ক্ষমতা যখন আমি জানি, তখন উপাস্যতায় আপনার সাথে শরীক হওয়ার দাবী কিরূপে করতে পারি ? এ পর্যন্ত উপরোক্ত কথাটি না বলার বিষয় বর্ণিত হয়েছে, পরবর্তী বাক্যে এর বিপরীত কথাটি বলে প্রমাণ করা হয়েছে যে) আমি তো তাদেরকে আর কিছুই বলিনি শুধু ঐ কথাই, (বলেছি) যা আপনি আমাকে বলতে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ্র দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমারও পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। এ পর্যন্ত ঈসা (আ) নিজ অবস্থা সম্পর্কে আরয করলেন। পরবর্তী বাক্যে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আরয করেছেন। কেননা, ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ---বাক্যে যদিও প্রকাশ্যত এ প্রশ্ন রয়েছে যে, তুমি তাদেরকে এ কথা বলেছ কিনা ? কিন্তু ইঙ্গিতে এ প্রশ্নও বোঝা যায় যে, ত্রিত্ববাদের এ বিশ্বাস কোত্থেকে এল ? সুতরাং ঈসা (আ) এ সম্পর্কে আরয করবেন যে, আর আমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলাম ততদিনই, যতদিন তাদের মধ্যে (বিদ্যমান) ছিলাম (অতএব বর্ণনা করতে পারি) অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন (অর্থাৎ প্রথমবার জীবিতাবস্থায় আকাশে নিয়ে এবং দ্বিতীয়বার মৃত্যু দিয়ে তখন (সে সময় শুধু) আপনি তাদের (অবস্থা) সম্বন্ধে অবগত ছিলেন (সে সময় আমি জানতাম না যে, তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ কি হল এবং কিভাবে হল)। বস্তুত আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। (এ পর্যন্ত নিজের এবং তাদের ব্যাপারে আরয করলেন। পরবর্তী বাক্যে তাদের এবং আল্লাহ্

তা'আলার ব্যাপারে বলেন যে) যদি আপনি তাদেরকে (এ বিশ্বাসের দরুন) শাস্তি দেন, তবে (আপনার ইচ্ছা, কেননা) এরা আপনারই দাস (এবং আপনি তাদের প্রভু। অপরাধের দরুন দাসকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার প্রভুর আছে) আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে (তাও আপনার ইচ্ছা--) আপনি তো মহাপরাক্রান্ত (ক্ষমতাশীল অতএব ক্ষমা করতেও সক্ষম এবং) মহাবিজ্ঞ (কাজেই আপনার ক্ষমাও বিজ্ঞতা অনুযায়ী হবে। তাই এটাও মন্দ হতে পারে না। উদ্দেশ্য এই যে, উভয় অবস্থাতেই আপনি স্বেচ্ছাধীন। আমি কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না)।

[মোটকথা, ঈসা (আ)-র প্রথম নিবেদন سبحانك বাক্য ত্রিত্ববাদীদের বিশ্বাস ও তাঁর শিক্ষাদানের ব্যাপারে নিজের সাফাই পেশ করলেন। আর وكنت عليهم বাক্যে সাফাই হল তাদের এ বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানার ব্যাপারে এবং তৃতীয় নিবেদন ان تعذبهم বাক্যে তাদের সম্পর্কে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা থেকে সাফাই প্রকাশ করে দিয়েছেন। ঈসা (আ)-র সাথে এসব কথোপকথন দ্বারা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য তাই ছিল। সুতরাং এসব বাক্য বিনিময়ে কাফিররা স্বীয় মূর্খতার দরুন পুরোপুরি তিরস্কৃত হবে এবং ব্যর্থতার দরুন মর্মাহত হবে]।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى---আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন। সুতরাং অজানাকে জানার জন্য ঈসা (আ)-কে প্রশ্ন করা হয়নি। বরং এর উদ্দেশ্য খৃস্টান জাতিকে তিরস্কার করা ও ধিক্কার দেওয়া যে, যাকে তোমরা উপাস্য মনে করছ তিনি স্বয়ং তোমাদের বিশ্বাসের বিপরীতে স্বীয় দাসত্ব স্বীকার করছেন এবং তোমাদের অপবাদ থেকে তিনি মুক্ত।--- (ইবনে-কাসীর)

فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ---হযরত ঈসা (আ)-র মৃত্যু অথবা আকাশে উত্থিত করা ইত্যাদি বিষয়ে সূরা আলে-ইমরানের--- اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেওয়া দরকার। فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ বাক্যটিকে ঈসা (আ)-র মৃত্যুর দলীল ও আকাশে উত্থিত হওয়ার বিষয়কে অস্বীকার করার প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা ঠিক নয়। কেননা এ কথোপ-কথন কিয়ামতের দিন হবে। তখন আকাশ থেকে অবতরণের পর তাঁর সত্যিকার মৃত্যু

হবে অতীত বিষয়। ইবনে কাসীর আবূমূসা আশ'আরীর রেওয়ায়েতক্রমে এক হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, কিয়ামতের দিন নবী-রসূলগণকে ও তাঁদের উম্মতকে ডাকা হবে। অতঃপর ঈসা (আ)-কে ডাকা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে স্বীয় নিয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন এবং নিকটে এনে বলবেন ঃ হে মরিয়ম-তনয় ঈসা,

اُذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি

আমি যে সমস্ত নিয়ামত দান করেছিলাম তা স্মরণ কর। অবশেষে বলবেন ঃ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ—হে ঈসা, তুমি কি লোকদেরকে এমন কথা বলেছ যে, আমাকে ও আমার মাতাকে আল্লাহ্ ছাড়া উপাস্যরূপে গ্রহণ কর? ঈসা (আ) বলবেন ঃ পরওয়ারদেগার আমি এরূপ বলিনি। এরপর খৃস্টানদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তারা বলবে ঃ হ্যাঁ, তিনি আমাদেরকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। এরপর খৃস্টানদেরকে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হবে।

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ—অর্থাৎ আপনি বান্দাদের প্রতি জুলুম ও অন্যায় কঠোরতা করতে পারেন না। তাই তাদের শাস্তি দিলে তা ন্যায়বিচার ও বিজ্ঞতাভিত্তিকই হবে। অগত্যা যদি ক্ষমা করে দেন, তবে এ ক্ষমাও অক্ষমতাপ্রসূত হবে না। কেননা, আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। তাই কোন অপরাধী আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারবে না। যেহেতু আপনি সুবিজ্ঞ, তাই এটাও সম্ভব নয় যে, অপরাধীকে বিনা বিচারেই ছেড়ে দেবেন। মোট কথা অপরাধীদের ব্যাপারে আপনি যে রায়ই দেবেন, তাই সম্পূর্ণ বিজ্ঞ-জনোচিত ও সক্ষমতাসুলভ হবে। হযরত ঈসা (আ) হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবেন। সেখানে কাফিরদের পক্ষে কোনরূপ সুপারিশ, দয়া, ভিক্ষা ইত্যাদি চলবে না। তাই তিনি عزيز حكيم -এর পরিবর্তে غفور رحيم ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ অবলম্বন করেন নি। এর বিপরীতে হযরত ইবরাহীম (আ) দুনিয়াতে পরওয়ারদেগারের দরবারে আরয করে-ছিলেন।

رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهُ مِنِّىْ وَمَنْ عَصَانِىْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ -

হে পরওয়ারদেগার, এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। তাদের মধ্যে যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার লোক এবং যে আমার অবাধ্যতা করে, তুমি অত্যন্ত

ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। অর্থাৎ এখনও সময় আছে, তুমি স্বীয় রহমতে ভবিষ্যতে তাদেরকে তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তনের শক্তি দান করে অতীত গোনাহ্ ক্ষমা করতে পার।---(ফাওয়ায়েদে-ওসমানী)

ইবনে-কাসীর হযরত আবূ যর (রা)-এর রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা) একবার সারারাত إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ --আয়াতখানিই পাঠ করতে থাকেন। ভোর হলে আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)! আপনি একই আয়াত পাঠ করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সিজদা করেছেন। তিনি বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের জন্য শাফাআতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্য শাফাআত করতে পারব, যে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কোন অংশীদার করেনি।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মহানবী (সা) উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে আকাশের দিকে হস্ত উত্তোলন করেন এবং বলেন ঃ اللهم امتى ---অর্থাৎ হে পাক পরওয়ার-দেগার, আমার উম্মতের প্রতি করুণার দৃষ্টি দাও। অতঃপর তিনি কাঁদতে থাকেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে এভাবে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি জিবরাঈলকে উপরোক্ত উক্তি শুনিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে বললেন ঃ তা হলে যাও এবং (হযরত) মুহাম্মদ (সা)-কে বলে দাও যে, আমি অতি সত্বর আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব—অসন্তুষ্ট করব না।

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ۭ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا
عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيْهِنَّ ۭ
وَهُوَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(১১৯) আল্লাহ্ বলবেন ঃ আজকের দিনে সত্যবাদীদের সত্যবাদিতা তাদের উপকারে আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে; তারা তাতেই চিররকাল থাকবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট। এটিই মহান সফলতা। (১২০) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল এবং এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্রই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।

যোগসূত্র ঃ পূর্ববর্তী দুই রুকূতে কিয়ামতের দিন মানুষের কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ

ও প্রশ্নোত্তর উল্লিখিত হয়েছে। এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে এর তদন্ত ও হিসাব-নিকাশের ফলাফল বর্ণিত হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(উপরোক্ত কথোপকথনের পর) আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ আজকের দিনে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যারা (ইহজগতে উক্তি, কর্ম ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) সত্যপরায়ণ ছিল, (যে সত্যপরায়ণ হওয়া এখন প্রকাশ পাচ্ছে। সব পয়গম্বর ও সব ঈমানদারই এর অন্তর্ভুক্ত। পয়গম্বরদের তো সম্বোধনই করা হচ্ছে এবং ঈমানদারদের ঈমান সম্পর্কে সব পয়গম্বর ও ফেরেশতা সাক্ষ্য দেবেন। এসব সম্বোধনে পয়গম্বরদের সত্যতা ও ঈসা (আ)-র সত্যতার প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে। মোট কথা এরা সবাই, যারা ইহজগতে সত্যপরায়ণ ছিলেন) তাদের সত্যপরায়ণতা তাদের উপকারে আসবে (এবং এ উপকারে আসা এই যে) তারা (বেহেশতের) উদ্যান (বসবাসের জন্য) পাবে, যার (প্রাসাদসমূহের) তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত হবে। তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (এবং এসব নিয়ামত তারা কেন পাবে না, কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। আর তারাও আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। (যে ব্যক্তি নিজে সন্তুষ্ট এবং তার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলাও সন্তুষ্ট, সে এ ধরনের নিয়ামতই লাভ করে) এটিই (অর্থাৎ যা উল্লিখিত হল) মহান সফলতা। (জগতের কোন সফলতা এর সমতুল্য হতে পারে না।) নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত সবকিছুর আধিপত্য আল্লাহ্র জন্যই এবং তিনি সবকিছুর উপর শক্তিমান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قَالَ اللّٰهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصّٰدِقِيْنَ صِدْقُهُمْ ——সাধারণভাবে বাস্তবসম্মত উক্তিকে 'সিদক' তথা সত্য এবং বাস্তব বিরুদ্ধ উক্তিকে 'কিযব' তথা মিথ্যা মনে করা হয়। কোরআন-সুন্নাহ্ থেকে জানা যায় যে, সত্য ও মিথ্যা শুধু উক্তি নয় কর্মও হতে পারে। নিম্নোক্ত হাদীসে বাস্তব বিরোধী কর্মকে মিথ্যা বলা হয়েছে।

من تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبى زور —অর্থাৎ কেউ যদি এমন অলঙ্কারে সজ্জিত হয়, যা তাকে দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ এমন কোন গুণ বা কর্ম দাবী করে, যা তার মধ্যে নেই, তবে সে যেন মিথ্যার বস্ত্র পরিধান করে।

অন্য এক হাদীসে প্রকাশ্যে ও গোপনে উত্তমরূপে নামায আদায়কারীকে সত্য বান্দা বলা হয়েছে ঃ

ان العبد اذا صلى فى العلانية فاحسن وصلى فى السر فاحسن قال الله تعالى هذا عبدى حقا ـ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জনসমক্ষে উত্তমরূপে নামায পড়ে এবং নির্জনতায়ও এমনিভাবে

নামায পড়ে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ সে আমার সত্যিকার বান্দা।—(মিশকাত)

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহ্র প্রতি। এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ জান্নাত পাওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা বলবেনঃ বড় নিয়ামত এই যে, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট; এখন থেকে কখনও তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।

ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ—অর্থাৎ এটিই মহান সফলতা। স্রষ্টা ও পরম প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়ে গেলে এর চাইতে বৃহত্তম সফলতা আর কি হতে পারে?

فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَّاٰخِرًا

সূরা আল-আন'আম

(মক্কায় অবতীর্ণ, ১৬৫ আয়াত, ২০ রুকূ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّوْرَ ۗ
ثُمَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ ① هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ
قَضٰٓى اَجَلًا ۭ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ ② وَهُوَ اللّٰهُ
فِى السَّمٰوٰتِ وَفِى الْاَرْضِ ۭ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُوْنَ ③ وَمَا تَاْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا
مُعْرِضِيْنَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاۗءَهُمْ ۭ فَسَوْفَ يَاْتِيْهِمْ
اَنْۢبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ⑤

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

(১) সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন। তথাপি কাফিররা স্বীয় পালনকর্তার সাথে অন্যান্যকে সমতুল্য স্থির করে। (২) তিনিই তোমাদেরকে মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর নির্দিষ্টকাল নির্ধারণ করেছেন। আর অপর নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্‌র কাছে রয়েছে। তথাপি তোমরা সন্দেহ কর। (৩) তিনিই আল্লাহ্ নভোমণ্ডলে এবং ভূ-মণ্ডলে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা কর তাও অবগত। (৪) তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে কোন নিদর্শন আসেনি; যার প্রতি তারা বিমুখ হয় না। (৫) অতএব, অবশ্য তারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে যখন তা তাদের কাছে এসেছে। বস্তুত অচিরেই তাদের কাছে ঐ বিষয়ের সংবাদ আসবে, যা নিয়ে তারা উপহাস করত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্যঃ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন

এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করেছেন ; তথাপি কাফিররা (ইবাদতে অন্যকে) স্বীয় পালন-কর্তার সমতুল্য স্থির করে। তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি তোমাদের (সবাই)-কে [আদম (আ)-এর মাধ্যমে] মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (তোমাদের মৃত্যুর) নির্দিষ্টকাল স্থির করেছেন এবং (পুনরায় জীবিত হয়ে উত্থিত হওয়ার) অন্য নির্দিষ্টকাল আল্লাহ্রই কাছে (নিরূপিত) রয়েছে, তথাপি তোমরা (অর্থাৎ তোমাদের কতিপয় লোক) সন্দেহ কর (অর্থাৎ কিয়ামতকে অসম্ভব মনে কর। অথচ যিনি প্রথমবার জীবন দান করেছেন, পুনর্বার জীবন দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন নয়) এবং তিনিই প্রকৃত উপাস্য নভোমণ্ডলেও এবং ভূমণ্ডলেও (অর্থাৎ অন্যসব উপাস্য মিথ্যা।) তিনি তোমাদের গোপন বিষয় এবং প্রকাশ্য বিষয় (সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে) জানেন (এবং বিশেষভাবে) তোমরা যা কিছু (প্রকাশ্য ও গোপনে) কাজ কর (যার উপর প্রতিদান ও শাস্তি নির্ভরশীল) তাও জানেন। আর তাদের (কাফিরদের) কাছে তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী থেকে (এমন) কোন নিদর্শন আসেনি, যা থেকে তারা বিমুখ হয়নি। অতএব (যেহেতু এটি তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তাই) তারা এ সত্য (গ্রন্থ কোরআন)-কেও মিথ্যা বলেছে, যখন তা তাদের কাছে পৌঁছেছে। বস্তুত (তাদের এ মিথ্যা বলা বিফলে যাবে, বরং) অচিরেই তাদের নিকট সেই (শাস্তির) সংবাদ আসবে, যার সাথে তারা উপহাস করত (অর্থাৎ কোরআনে যে শাস্তির কথা শুনে তারা উপহাস করত। এর সংবাদ পাওয়ার অর্থ এই যে, যখন শাস্তি অবতীর্ণ হবে, তখন এ সংবাদের সত্যতা চাক্ষুষ দেখে নেবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ সূরা আন'আমের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কয়েকখানি আয়াত ব্যতীত গোটা সূরাটিই একযোগে মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। সত্তর হাজার ফেরেশতা তসবীহ পাঠ করতে করতে এ সূরার সাথে অবতরণ করেছিলেন। তফসীর-বিদদের মধ্যে মুজাহিদ, কলবী, কাতাদাহ প্রমুখও প্রায় একথাই বলেন।

আবূ ইসহাক ইসফারায়িনী বলেন ঃ এ সূরাটিতে তওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ সূরাটিকে الحمد لله বাক্য দ্বারা আরম্ভ করা হয়েছে। এতে খবর দেওয়া হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য এ খবরের উদ্দেশ্য মানুষকে প্রশংসা শিক্ষা দেওয়া এবং এ বিশেষ পদ্ধতির শিক্ষাদানের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি কারও হামদ বা প্রশংসার মুখাপেক্ষী নন। কেউ প্রশংসা করুক বা না করুক, তিনি স্বীয় ওজুদ বা সত্তার পরাকাষ্ঠার দিক দিয়ে নিজেই প্রশংসনীয়। এ বাক্যের পর নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং অন্ধকার ও আলো সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রশংসনীয় হওয়ার প্রমাণও ব্যক্ত করা হয়েছে যে, যে সত্তা এহেন মহান শক্তি-সামর্থ্য ও বিজ্ঞতার বাহক, তিনিই হাম্দ ও প্রশংসার যোগ্য হতে পারেন।

এ আয়াতে سماوات শব্দটিকে বহুবচনে এবং ارض শব্দটিকে একবচনে উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও অন্য এক আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নভোমণ্ডলের ন্যায়

ভূমণ্ডলও সাতটি। সম্ভবত এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সপ্ত আকাশ আকার-আকৃতি ও অন্যান্য অবস্থার দিক দিয়ে একটি অপরটি থেকে অনেক স্বতন্ত্র কিন্তু সপ্ত পৃথিবী পরস্পর সমআকৃতি বিশিষ্ট ; তাই এগুলোকে এক গণ্য করা হয়েছে। -(মাযহারী)

এমনিভাবে ظلمات শব্দটি বহুবচনে এবং نور শব্দটিকে এক বচনে উল্লেখ করার মাঝে ইঙ্গিত রয়েছে যে, نور বলে বিশুদ্ধ ও সরল পথ ব্যক্ত করা হয়েছে এবং তা মাত্র একটিই। আর ظلمات বলে ভ্রান্ত পথ ব্যক্ত করা হয়েছে, যা অসংখ্য। —(মাযহারী ও বাহরে-মুহীত)

এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল নির্মাণ করাকে خلق শব্দ দ্বারা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব করাকে جعل শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, অন্ধকার ও আলো নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মত স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর বস্তু নয়, বরং পরনির্ভর, আনুষঙ্গিক ও গুণবাচক বিষয়। অন্ধকারকে আলোর পূর্বে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ জগতে অন্ধকার হল আসল এবং আলো বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাথে জড়িত। সেসব বস্তু সামনে থাকলে আলোর উদ্ভব হয়, না থাকলে সবকিছু অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য একত্ববাদের স্বরূপ ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বর্ণনা করে জগতের ঐসব জাতিকে হুঁশিয়ার করা, যারা মূলত একত্ববাদে বিশ্বাসী নয় কিংবা বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও একত্ববাদের তাৎপর্যকে পরিত্যাগ করে বসেছে।

অগ্নি-উপাসকদের মতে জগতের স্রষ্টা দু'জন —ইয়াযদান ও আহ্‌রামান। তারা ইয়াযদানকে মঙ্গলের স্রষ্টা এবং আহ্‌রামানকে অমঙ্গলের স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে। এ দুটিকেই তারা অন্ধকার ও আলো বলে ব্যক্ত করে।

ভারতের পৌত্তলিকদের মতে তেত্রিশ কোটি দেবতা আল্লাহ্‌র অংশীদার। আর্য সমাজ একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও আত্মা ও মূল পদার্থকে অনাদি এবং আল্লাহ্‌র শক্তি-সামর্থ্য ও সৃষ্টি থেকে মুক্ত সাব্যস্ত করে একত্ববাদের মূল স্বরূপ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। এমনিভাবে খৃস্টানরা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়ার সাথে সাথে হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর মাতাকে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। এরপর একত্ববাদের বিশ্বাসকে টিকিয়ে রাখার জন্য তারা 'একে তিন' এবং 'তিনে এক'-এর অযৌক্তিক মতবাদের আশ্রয় নিয়েছে। আরবের মুশরিকরা তা আল্লাহ্‌র বণ্টনে চূড়ান্ত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছে। প্রতিটি পাহাড়ের প্রতিটি বড় পাথরও তাদের মতে মানবজাতির উপাস্য হতে পারত। মোট কথা, যে মানবকে আল্লাহ্ তা'আলা 'আশরাফুল-মখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা করেছিলেন, তারা যখন পথভ্রষ্ট হল, তখন চন্দ্র, সূর্য, তারকারাজি, আকাশ, পানি, বৃক্ষলতা এমনকি, পোকা-মাকড়কেও সিজদার যোগ্য উপাস্য, রুযীদাতা ও বিপদ বিদূরণকারী সাব্যস্ত করে নিল।

কোরআন পাক আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলাকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভাবক বলে উপরোক্ত সব ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করেছে।

কেননা, অন্ধকার ও আলো, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতে উৎপন্ন যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট। অতএব এগুলোকে কেমন করে আল্লাহ্ তা'আলার অংশীদার সাব্যস্ত করা যায় ?

প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের বৃহত্তর বস্তুগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট ও মুখাপেক্ষী বলে মানুষকে নির্ভুল একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে মানুষকে বলা হয়েছে যে, তোমার অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ বিশেষ। যদি এরই সূচনা, পরিণতি ও বাসস্থানের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, তবে একত্ববাদ একটা বাস্তব সত্য হয়ে সামনে ফুটে উঠবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সেই সত্তা, যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-কে এক বিশেষ পরিমাণ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর অংশ এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ কারণেই আদম-সন্তানরা বর্ণ, আকার এবং চরিত্র ও অভ্যাসে বিভিন্ন। কেউ কৃষ্ণবর্ণ, কেউ শ্বেতবর্ণ, কেউ লাল বর্ণ, কেউ কঠোর, কেউ নম্র, কেউ পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্ট এবং কেউ অপবিত্র স্বভাবের হয়ে থাকে।---(মাযহারী)

এই হচ্ছে মানব সৃষ্টির সূচনা। এর পর পরিণতির দু'টি মনযিল উল্লেখ করা হয়েছে। একটি মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি, যাকে মৃত্যু বলা হয়। অপরটি সমগ্র মানবগোষ্ঠীর ও তার উপকারে নিয়োজিত সৃষ্ট জগৎ---সবার সমষ্টির পরিণতি, যাকে কিয়ামত বলা হয়। মানবের ব্যক্তিগত পরিণতি বোঝাবার জন্য বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا — অর্থাৎ মানব সৃষ্টির পর আল্লাহ্ তা'আলা তার স্থায়িত্ব ও আয়ুষ্কালের জন্য একটি মেয়াদ নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ মেয়াদের শেষ প্রান্তে পৌঁছার নাম মৃত্যু। এ মেয়াদ মানবের জানা না থাকলেও আল্লাহ্র ফেরেশতারা জানেন, বরং এ দিক দিয়ে মানুষও মৃত্যু সম্পর্কে অবগত। কেননা সে সর্বদা, সর্বত্র আশেপাশে আদম-সন্তানদেরকে মৃত্যুবরণ করতে দেখে।

এরপর সমগ্র বিশ্বের পরিণতি অর্থাৎ কিয়ামতের উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ — অর্থাৎ আরও একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে, যা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এ মেয়াদের পূর্ণ জ্ঞান ফেরেশতাদের নেই এবং মানুষেরও নেই।

সার কথা এই যে, প্রথম আয়াতে বৃহৎ জগৎ অর্থাৎ গোটা বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্মিত। দ্বিতীয় আয়াতে এমনিভাবে ক্ষুদ্র জগৎ অর্থাৎ মানুষ যে আল্লাহ্র সৃষ্ট জীব, তা বর্ণিত হয়েছে। এরপর মানুষকে শৈথিল্য থেকে জাগ্রত করার জন্য বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক মানুষের একটি বিশেষ আয়ুষ্কাল রয়েছে

যার পর তার মৃত্যু অবধারিত। প্রতিটি মানুষ এ বিষয়টি সর্বক্ষণ নিজের আশেপাশে প্রত্যক্ষ করে। وَاَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهٗ বাক্যে এ নির্দেশ রয়েছে যে, মানুষের ব্যক্তিগত মৃত্যুকে যুক্তি ও প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করিয়ে সমগ্র বিশ্বের ব্যাপক মৃত্যু অর্থাৎ কিয়ামতকে সপ্রমাণ করা একটা মনস্তাত্ত্বিক ও স্বাভাবিক বিষয়। তাই কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এ কারণে আয়াতের শেষভাগে উপযুক্ততা প্রকাশার্থে বলা হয়েছে ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ — অর্থাৎ এহেন সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ সত্ত্বেও তোমরা কিয়ামত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ কর। এটা অনুচিত।

তৃতীয় আয়াতে প্রথম দু'আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এমন এক সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য এবং তিনিই তোমাদের প্রতিটি প্রকাশ্য ও গোপন অবস্থা এবং প্রতিটি উক্তি ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি পরিজ্ঞাত।

চতুর্থ আয়াতে অমনোযোগী মানুষের হঠকারিতা ও সত্যবিরোধী জেদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

—وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ مِّنْ اٰيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার একত্ববাদের সুস্পষ্ট যুক্তি-প্রমাণ ও নিদর্শন সত্ত্বেও অবিশ্বাসীরা এ কর্মপন্থা অবলম্বন করে রেখেছে যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের হেদায়েতের জন্য যে কোন নিদর্শন প্রেরণ করা হয়, তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—এ সম্পর্কে মোটেই চিন্তা-ভাবনা করে না।

পঞ্চম আয়াতে কতিপয় ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে এ অমনোযোগিতার আরও বিবরণ দেওয়া হয়েছে ঃ فَقَدْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ — অর্থাৎ সত্য যখন তাদের সামনে প্রতিভাত হল, তখন তারা সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এখানে 'সত্যের' অর্থ কোরআন হতে পারে এবং নবী করীম (সা)-এর পবিত্র ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

কেননা, মহানবী (সা) আজীবন আরব গোত্রসমূহের মধ্যেই অবস্থান করেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবন এবং যৌবন থেকে বার্ধক্য তাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা একথাও পুরোপুরিই জানত যে, মহানবী (সা) কোন মানুষের কাছে এক অক্ষরও শিক্ষালাভ করেন নি। এমনকি তিনি নিজ হাতে নিজের নামও লিখতে পারতেন না। সারা আরবে তিনি উম্মী (নিরক্ষর) উপাধিতে খ্যাত ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়স এভাবেই অতিবাহিত হয়ে যায় যে, তিনি কোন দিন কবিতা বা কাব্যচর্চার দিকে আকৃষ্ট হন নি এবং কখনো বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হন নি। চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে যেতেই অকস্মাৎ তাঁর মুখ দিয়ে নিগূঢ় তত্ত্ব, অধ্যাত্মবিদ্যা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন স্রোতধারা প্রবাহিত হতে লাগল, যা জগতের পারদর্শী দার্শনিকদেরকেও বিস্ময়াভিভূত করে দেয়। তিনি নিজের আনীত কালামের মুকাবিলা করার জন্য

আরবের স্বনামখ্যাত প্রাঞ্জলভাষী কবি-সাহিত্যিক ও অলংকারবিদদের চ্যালেঞ্জ দিলেন। তারা মহানবী (সা)-কে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য স্বীয় জানমাল, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন বিসর্জন দিতে সর্বদা প্রস্তুত থাকত, অথচ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে কোর-আনের একটি আয়াতের অনুরূপ বাক্য রচনা করার সাহস তাদের কারও হল না।

এভাবে নবী করীম (সা) এবং কোরআনের অস্তিত্ব ছিল সত্যের এক বিরাট নিদর্শন। এছাড়া মহানবী (সা)-র মাধ্যমে হাজারো মো'যেজা ও খোলাখুলি নিদর্শন প্রকাশ পায়, যে কোন সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষ যা অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু কাফিররা এসব নিদর্শনকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিল। তাই আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ

আয়াতের শেষে তাদের অস্বীকৃতি ও মিথ্যারোপের অশুভ পরিণতির দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ—অর্থাৎ আজ তো এসব অপরিণামদর্শী লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা, তাঁর আনীত হেদায়েত, কিয়ামত ও পরকাল সবকিছু নিয়েই হাস্যোপহাস করছে, কিন্তু সে সময় দূরে নয়, যখন এগুলোর স্বরূপ তাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হবে। কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে। ঈমান ও আমলের হিসাব দিতে হবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পাবে। তখন এগুলোকে বিশ্বাস ও স্বীকার করলেও কোন উপকার হবে না। কেননা, সেটা কর্মজগৎ নয়---প্রতিদান দিবস। আল্লাহ্ তা'আলা এখনও চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দিয়েছেন। এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহ্র নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করলেই ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হবে

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ
مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ
تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ
قَرْنًا آخَرِينَ ۝ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ
بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۝ وَقَالُوا
لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۝
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۝ وَلَقَدِ

اَسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا
بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ۝١٠ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝١١

(৬) তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, যা তোমাদেরকে দিইনি। আমি আকাশকে তাদের উপর অনবরত বৃষ্টি বর্ষণ করতে দিয়েছি এবং তাদের তলদেশে নদী সৃষ্টি করে দিয়েছি, অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। (৭) যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম, অতঃপর তারা তা স্বহস্তে স্পর্শ করত, তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (৮) তারা আরও বলে যে, তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করা হল না? যদি আমি কোন ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটাই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হত না। (৯) যদি আমি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম, তবে সে মানুষের আকারেই হত। এতেও ঐ সন্দেহই করত, যা এখন করেছে। (১০) নিশ্চয়ই আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের সাথেও উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাঁদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে ঐ শাস্তি বেষ্টন করে নিল, যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলে দিনঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর, অতঃপর দেখ, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি দেখেনি যে, আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে (শারীরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে) এমন প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম —যা তোমাদেরকে দিইনি এবং আমি তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করার জন্য আসমানকে অব্যাহতি দিয়েছিলাম এবং আমি তাদের (ক্ষেত ও বাগানের) তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত করে-ছিলাম (ফলে কৃষি ও ফলমূলের প্রভূত উন্নতি হয় এবং তারা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে থাকে) অতঃপর (এহেন শক্তি-সামর্থ্য ও সাজসরঞ্জাম সত্ত্বেও) আমি তাদেরকে তাদের পাপের কারণে (বিভিন্ন প্রকার আযাব দ্বারা) ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের পরে অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছি। অতএব তোমাদের উপরও আযাব অবতীর্ণ করলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের একগুঁয়েমির অবস্থা এই যে, যদি আমি কাগজে লিখিত কোন বিষয় তাদের প্রতি নাযিল করতাম অতঃপর তারা তা নিজের হাতে স্পর্শও করত (যেমন তাদের দাবী ছিল যে, আকাশ থেকে লিখিত গ্রন্থ আসুক। হাতে স্পর্শ করার কথা উল্লেখ করে ভেল্কী দেওয়ার সন্দেহ দূর করা হয়েছে।) তবুও অবিশ্বাসীরা একথাই বলত যে, এটি

প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (কারণ যখন মেনে নেওয়ার ইচ্ছাই নেই, তখন প্রতিটি প্রমাণেই তাদের পক্ষে কোন-না-কোন নতুন অজুহাত বের করা মোটেই কঠিন নয়।) এবং তারা আরও বলে যে, তাঁর (অর্থাৎ পয়গম্বরের) কাছে (এমন) কোন ফেরেশতা (যাকে আমরা দেখতে পাব এবং কথাবার্তা শুনব) কেন প্রেরণ করা হল না? (আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ) যদি আমি কোন ফেরেশতা (এমনিভাবে) প্রেরণ করতাম, তবে গোটা ব্যাপারটিই শেষ হয়ে যেত। অতঃপর (ফেরেশতা অবতরণের পরে) তাদেরকে সামান্যও অবকাশ দেওয়া হত না। (--কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার চিরাচরিত রীতি এই যে, প্রার্থিত মো'জেযা দেখানোর পরও যদি কেউ তা অস্বীকার করে, তবে এক মুহূর্তও অবকাশ না দিয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয় এবং এরূপ প্রার্থিত মো'জেযা না দেখানো পর্যন্ত দুনিয়াতে অবকাশ দেওয়া হয়।) এবং যদি আমি তাকে (অর্থাৎ রসূলকে) ফেরেশতাই করতাম, তবে (ফেরেশতা ---প্রেরণ করলে তার ভীতি মানুষ সহ্য করতে পারত না। তাই) আমি তাকে (ফেরেশতাকে) মানুষরূপেই প্রেরণ করতাম (অর্থাৎ মানুষের আকৃতিতেই প্রেরণ করতাম) এতেও সন্দেহই করত, যা এখন করছে। অর্থাৎ এ ফেরেশতাকে মানুষ মনে করে এরূপ আপত্তিই করত। মোট কথা, তাদের ফেরেশতা অবতারণের দাবীটি পূর্ণ করা হলে তাতে তাদের কোন উপকার হতো না। কেননা, ফেরেশতাকে ফেরেশতার আকৃতিতে দেখার শক্তি তাদের নেই। পক্ষান্তরে ফেরেশতাকে মানুষের আকৃতিতে প্রেরণ করলে তাদের সন্দেহ দূর হবে না। তদুপরি তাদের ক্ষতি হবে। কারণ, অমান্য করার কারণে তারা আযাবে পতিত হবে। এবং (আপনি তাদের বাজে দাবীর কথা শুনে দুঃখিত হবেন না। কেননা,) আপনার পূর্বে যাঁরা পয়গম্বর হয়েছেন, তাঁদের সাথেও (বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে) এমনিভাবে উপহাস করা হয়েছে। অতঃপর যারা তাদের সাথে উপহাস করেছিল, তাদেরকে সে শাস্তি পরিবেষ্টন করে নিয়েছে যাকে তারা উপহাস করত। (এতে জানা গেল যে, তাদের এ জাতীয় কর্ম দ্বারা পয়গম্বরদের কোন ক্ষতি হয়নি বরং এ কর্ম স্বয়ং তাদের জন্যই আযাব ও বিপদের কারণ হয়েছে। যদি তারা পূর্ববর্তী উম্মতদের আযাব অস্বীকার করে, তবে) আপনি (তাদেরকে) বলে দিন ঃ তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর ; অতঃপর দেখ যে, মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কি হয়েছে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যারা আল্লাহ্র বিধান ও পয়গম্বরদের শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিত কিংবা বিরোধিতা করত, তাদের প্রতি কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব অবিশ্বাসীর দৃষ্টি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি আকৃষ্ট করে তাদেরকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে বিশ্ব-ইতিহাস একটি শিক্ষাগ্রন্থ। জ্ঞানচক্ষু মেলে নিরীক্ষণ করলে এটি হাজারো উপদেশের চাইতে অধিক কার্যকরী উপদেশ। 'জগৎ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কাল উৎকৃষ্ট শিক্ষক'---জনৈক দার্শনিকের এ উক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ কারণেই কোরআন পাকের একটি বিরাট বিষয়বস্তু হচ্ছে কাহিনী ও ইতিহাস। কিন্তু সাধারণভাবে অমনোযোগী মানুষেরা জগতের ইতিহাসকেও একটি চিত্তবিনোদনের সামগ্রীর চাইতে অধিক গুরুত্ব দেয়নি ; বরং উপদেশ ও জ্ঞানের এ উৎকৃষ্ট বিষয়টিকেও তারা অমনোযোগিতা ও গোনাহের উপায় হিসাবে

গ্রহণ করেছে। পূর্ববর্তী কিসসা-কাহিনীকে হয় শুধু ঘুমের পূর্বে ঘুমের ঔষধের স্থলে ব্যবহার করা হয়, না হয় অবসর সময়ে চিত্তবিনোদনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সম্ভবত এ কারণেই কোরআন পাক শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বিশ্ব-ইতিহাসকে বেছে নিয়েছে। তবে কোরআনের বর্ণনাভঙ্গি বিশ্বের সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের মত নয় যাতে কাহিনী ও ইতিহাস রচনাই মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। তাই কোরআন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ধারাবাহিক কাহিনীর আকারে বর্ণনা করেনি। বরং কাহিনীর যতটুকু অংশ যে ব্যাপারে ও যে অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত সে ব্যাপারে ততটুকু অংশই উল্লেখ করেছে। অতঃপর অন্যত্র এ কাহিনীর অন্য অংশ বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যের কারণে বর্ণনা করেছে। এতে এ সত্যের দিকে ইঙ্গিত হতে পারে যে, কোন কাহিনী কখনও স্বয়ং উদ্দেশ্য হয় না, বরং প্রত্যেক ঘটনা বর্ণনা করার লক্ষ্য হচ্ছে তা থেকে কোন কার্যকর ফল বের করা। এ কারণে এ ঘটনার যতটুকু অংশ এ লক্ষ্যের জন্য জরুরী, ততটুকু পাঠ কর এবং সামনে এগিয়ে যাও। স্বীয় অবস্থা পর্যালোচনা কর এবং অতীত ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা অর্জন করে আত্ম-সংশোধনে ব্রতী হও।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র প্রত্যক্ষ সম্বোধিত মক্কাবাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা কি পূর্ববর্তী জাতিসমূহের অবস্থা দেখেনি? দেখলে তা থেকে তারা শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করতে পারত। এখানে 'দেখা'র অর্থ তাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা। কেননা, সে জাতিগুলো তখন তাদের সামনে ছিল না। এরপর পূর্ববর্তী জাতি-সমূহের ধ্বংস ও বিপর্যয় উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ ---অর্থাৎ তাদের পূর্বে অনেক 'কারনকে' (অর্থাৎ সম্প্রদায়কে) আমি ধ্বংস করে দিয়েছি। قرن শব্দের অর্থ একাধিক। সমসাময়িক লোকসমাজকেও قرن বলা হয় এবং সুদীর্ঘ কালকেও قرن বলা হয়। দশ বছর থেকে একশ বছর পর্যন্ত সময়কাল অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু قرن শব্দের অর্থ যে এক শতাব্দী, কোন কোন ঘটনা ও হাদীস থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়। এক হাদীসে আছে ঃ মহানবী (সা) আবদুল্লাহ্ ইবনে বিশর মায়োনীকে বলেছিলেন ঃ তুমি এক 'কারন' পর্যন্ত জীবিত থাকবে। পরে দেখা গেল যে, তিনি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিলেন। মহাবনী (সা) জনৈক বালককে দোয়া দেন যে, তুমি এক 'কারন' জীবিত থেকো। বালকটি পূর্ণ একশ বছর জীবিত ছিল। خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم এ হাদীসের অর্থ করতে গিয়ে অধিকাংশ আলিম 'এক কারন' বলতে এক শতাব্দী স্থির করেছেন।

এ আয়াতে অতীত জাতিসমূহ সম্পর্কে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে পৃথিবীতে এমন বিস্তৃতি, শক্তি ও জীবন ধারণের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন, যা পরবর্তী লোকদের ভাগ্যে জোটেনি। কিন্তু তারাই যখন পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করল এবং আল্লাহ্র নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করল, তখন প্রভূত জাঁকজমক, প্রতাপ-প্রতিপত্তি ও অর্থ-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারল না। তারা পৃথিবীর বুক থেকে

নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ মক্কাবাসীদেরকে সম্বোধন করা হচ্ছে। আদ ও সামূদ গোত্রের মত শক্তিবল তাদের নেই এবং সিরিয়া ও ইয়ামেনবাসীদের অনুরূপ স্বাচ্ছন্দ্যশীলও তারা নয়। এসব অতীত জাতির ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে দেখা তাদের উচিত। বিরুদ্ধাচরণ করলে তাদের পরিণতি কি হবে, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আয়াতের শেষভাগে বলা হয়েছে ঃ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ

—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি-সামর্থ্য শুধু প্রবল প্রতাপান্বিত অসাধারণ জাঁকজমক ও সাম্রাজ্যের অধিপতি এবং জনবহুল ও মহাপরাক্রান্ত জাতিসমূহকে চোখের পলকে ধ্বস করেই ক্ষান্ত হয়ে যায়নি, বরং তাদেরকে ধ্বংস করার সাথে সাথে তাদের স্থলে অন্য জাতি সৃষ্টি করে সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। ফলে কেউ বুঝতে পারল না যে, এখান থেকে লোকজন হ্রাস পেয়েছে।

এমনিতেও আল্লাহ্ তা'আলার এ শক্তি -সামর্থ্য আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে থাকি। দৈনিক লাখো মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু কারও স্থান অপূর্ণ থাকে না। কোন জায়গায় জনবসতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর সে জায়গা জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় না।

خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہِ ناز ہے کس کی؟
ہزاروں اٹھ گئے رونق وہی باقی ہے مجلس کی

একবার আরাফাতের ময়দানে প্রায় দশ লক্ষ লোকের সমাবেশে চিন্তাস্রোত এদিকে প্রবাহিত হল যে, আজ থেকে প্রায় সত্তর-আশি বছর আগে এ জনসমুদ্রের মধ্যে কেউ বিদ্যমান ছিল না এবং তাদের স্থলে প্রায় সমসংখ্যক অন্য মানুষ ছিল, কিন্তু আজ তাদের কোন চিহ্নই নেই। এভাবে প্রতিটি জনসমাবেশকে অতীত ও ভবিষ্যতের সাথে মিলিয়ে দেখলে প্রতিটি জনসমাবেশই কার্যকরী উপদেশদাতা দৃষ্টিগোচর হয়।

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

দ্বিতীয় আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। একদিন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সামনে একটি হঠকারিতাপূর্ণ দাবী পেশ করে বসল। সে বলল ঃ আমি আপনার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না, যে পর্যন্ত না আপনাকে আকাশে আরোহণ করে সেখান থেকে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসতে দেখব। গ্রন্থে আমার নাম উল্লেখ করে এ আদেশ লিপিবদ্ধ থাকতে হবে ঃ হে আবদুল্লাহ্! রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। সে আরও বলল ঃ আপনি এগুলো করে দেখালেও আমার মুসলমান হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতসব কথার পরও লোকটি মুসলমান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইসলামের গাযী হয়ে তায়েফ যুদ্ধে শাহাদতও বরণ করেছিল।

জাতির এহেন হঠকারিতাপূর্ণ দাবী-দাওয়া এবং উপহাসের ভঙ্গিতে কথাবার্তা পিতা-মাতার চাইতে অধিক স্নেহশীল রসূলে-করীম (সা)-এর অন্তরকে কতটুকু ব্যথিত করেছিল, তার সঠিক অনুমান আমরা করতে পারি না। শুধু ঐ ব্যক্তি হয়ত তা অনুভব করতে পারে, যে জাতির মঙ্গল ও কল্যাণ চিন্তাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মত জীবনের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিয়েছে।

এ কারণেই আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে ঃ তাদের এসব দাবী-দাওয়া কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য নয়। তাদের অবস্থা এই যে, তারা যেসব দাবী-দাওয়া করছে, আপনার সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য তার চাইতে সুস্পষ্ট প্রমাণাদি তাদের সামনে এলেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। উদাহরণত তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী আমি যদি আকাশ থেকে কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতরণ করে দিই, শুধু তাই নয়, তারা যদি তা স্বচক্ষে দেখেও নেয় এবং ভেল্কী সৃষ্টির আশংকা দূরীকরণার্থ হাতে স্পর্শও করে নেয় তবুও একথাই বলে দেবে যে, إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। কারণ, হঠকারিতাবশতই তারা এসব দাবী-দাওয়া করছে।

তৃতীয় আয়াত অবতরণেরও একটি ঘটনা রয়েছে। পূর্বোল্লিখিত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবী উমাইয়া, নযর ইবনে হারেস এবং নওফেল ইবনে খালেদ (রা) একবার একত্রিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয় এবং বলে ঃ আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব যদি আপনি আকাশ থেকে গ্রন্থ নিয়ে আসেন। গ্রন্থের সাথে চারজন ফেরেশতা এসে সাক্ষ্য দেবে যে, এ গ্রন্থ আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসেছে এবং আপনি আল্লাহ্র রসূল।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এর এক উত্তর এই যে, গাফিলরা এসব দাবী-দাওয়া করে মৃত্যু ও ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। কেননা, আল্লাহ্র আইন এই যে, কোন জাতি কোন পয়গম্বরের কাছে যখন বিশেষ কোন মো'জেযা দাবী করে এবং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তখন ইসলাম গ্রহণের সামান্য দেরীও সহ্য করা হয় না। ব্যাপক আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। মক্কাবাসীরাও এ দাবী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করছিল না যে, তা মেনে নেওয়ার আশা করা যেত। তাই বলা হয়েছে ঃ لَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ —অর্থাৎ আমি যদি তাদের চাহিদা মত মো'জেযা দেখানোর জন্য ফেরেশতা পাঠিয়ে দিই, তবে মো'জেযা দেখার পরও বিরুদ্ধাচরণ করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে ধ্বংসের নির্দেশ জারি হয়ে যাবে। এরপর তাদেরকে বিন্দুমাত্রও অবকাশ দেওয়া হবে না। কাজেই তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের চাওয়া মো'জেযা প্রকাশ না করলে তাদেরই মঙ্গল।

এরই দ্বিতীয় উত্তর চতুর্থ আয়াতে অন্যভাবে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এরা ফেরেশতা অবতারণের দাবী করে অদ্ভুত বোকামির পরিচয় দিচ্ছে। কেননা, ফেরেশতা যদি আসল আকার-আকৃতিতে সামনে আসে, তবে ভয়ে মানুষের অন্তরাত্মা কাঠ হয়ে যাবে। এমনকি, আতংকগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবার আশংকাও রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি মানবাকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা সামনে আসে, যেমন জিবরাঈল (আ) বহুবার মহানবী (সা)-র কাছে এসেছেন, তবে তারা তাঁকে একজন মানুষই মনে করবে এবং তাদের আপত্তি পূর্বাবস্থায়ই বহাল থাকবে।

এসব হঠকারিতাপূর্ণ কথাবার্তার উত্তর দেওয়ার পর পঞ্চম আয়াতে নবী করীম (সা)-এর সান্ত্বনার জন্য বলা হয়েছে ঃ স্বজাতির পক্ষ থেকে আপনি যে উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও যাতনা ভোগ করছেন, তা শুধু আপনারই বৈশিষ্ট্য নয়, আপনার পূর্বেও সব পয়গম্বরদের এমনি হৃদয়বিদারক ও প্রাণঘাতী ঘটনাবলীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁরা সাহস হারান নি। পরিণামে বিদ্রূপকারী জাতিকে সে আযাবই পাকড়াও করেছে, যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত।

মোট কথা এই যে, আল্লাহ্‌র বিধানাবলী প্রচার করাই আপনার কাজ। এ দায়িত্ব পালন করে আপনি দায়মুক্ত হয়ে যান। কেউ তা গ্রহণ করল কিনা তা দেখাশোনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। তাই এতে মশগুল হয়ে আপনি অন্তরকে ব্যথিত করবেন না।

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ قُلْ لِّلّٰهِ ۭ كَتَبَ عَلٰي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۭ لَيَجْمَعَنَّكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۭ اَلَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۭ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝ قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۭ قُلْ اِنِّىْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝

(১২) জিজ্ঞেস করুন, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে তার মালিক কে? বলে দিন ঃ মালিক আল্লাহ্‌। তিনি অনুকম্পা প্রদর্শনকে নিজ দায়িত্ব বলে লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে কিয়ামতের দিন একত্র করবেন। এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, তারাই বিশ্বাস স্থাপন করে না। (১৩) যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে, তাঁরই। তিনিই শ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (১৪) আপনি বলে দিন ঃ আমি কি আল্লাহ্‌ ব্যতীত—যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি সবাইকে আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না—অপরকে সাহায্যকারী স্থির করব? আপনি

বলে দিনঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই আজ্ঞাবহ হব। আপনি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি (এসব বিরোধীকে জব্দ করার জন্য) বলুনঃ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা আছে, তার মালিক কে? (প্রথমত তারাও এ উত্তরই দেবে। ফলে একত্ববাদ প্রমাণিত হবে এবং যদি কোন কারণে, যেমন পরাজয়ের ভয়ে এ উত্তর না দেয় তবে,) আপনি বলে দিনঃ সবার মালিক আল্লাহ্। (এবং তাদেরকে একথাও বলে দিন যে,) আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কৃপায় (তওবাকারীদের প্রতি) অনুগ্রহ করা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে নিয়েছেন (এবং আরও বলে দিন যে, তোমরা একত্ববাদ গ্রহণ না করলে শাস্তিও ভোগ করতে হবে। কেননা,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে অবশ্যই কিয়ামতের দিন (কবর থেকে তুলে হাশরের ময়দানে) একত্র করবেন (এবং কিয়ামতের অবস্থা এই যে,) এর আগমনে কোন সন্দেহ নেই। (কিন্তু) যারা নিজকে ক্ষতিগ্রস্ত (অর্থাৎ অকেজো) করেছে, বস্তুত তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। (এবং তাদেরকে জব্দ করার জন্য আরও বলুন যে,) যা কিছু রাত ও দিনে অবস্থিত, তা আল্লাহ্রই। (এ আয়াত এবং এর পূর্ববর্তী قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ আয়াত সমষ্টির সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, স্থান ও কালে যত বস্তু আছে, সবই আল্লাহ্র মালিকানাধীন।) এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (একত্ববাদ প্রমাণ করার পর তাদেরকে) বলুনঃ আমি আল্লাহ্কে ছাড়া---যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্রষ্টা এবং যিনি (সবাইকে) আহার্য দান করেন ও তাঁকে কেউ আহার্য দান করে না (কেননা, তিনি পানাহারের প্রয়োজন থেকে উর্ধ্বে। অতএব এমন আল্লাহ্কে ছাড়া) অপরকে স্বীয় উপাস্য স্থির করব? (আপনি এ অস্বীকৃতিসূচক প্রশ্নের ব্যাখ্যায় নিজে) বলে দিনঃ (আমি আল্লাহ্ ছাড়া অপরকে কিরূপে উপাস্য স্থির করতে পারি, যা যুক্তি ও ইতিহাসের পরিপন্থী?)। আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, সর্বাগ্রে আমিই ইসলাম কবুল করব (এতে একত্ববাদের বিশ্বাসও এসে গেছে।) এবং (আমাকে বলা হয়েছে যে,) তুমি কদাচ অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

قُلْ لِّمَنْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ ---আয়াতে কাফিরদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছেঃ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ে যা আছে, তার মালিক কে? অতঃপর আল্লাহ্ নিজেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বাচনিক উত্তর দিয়েছেনঃ সবার মালিক আল্লাহ্। কাফিরদের উত্তরের অপেক্ষা করার পরিবর্তে নিজেই উত্তর দেওয়ার কারণ এই যে, এ উত্তর কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত। তারা যদিও শিরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত ছিল, তথাপি ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও সবকিছুর মালিক আল্লাহ্ তা'আলাকেই মানত।